পাঠ উপকরণ - ১

অধিকার, মানবাধিকার এবং মৌলিক অধিকার

অধিকার :সম্পর্কের ভিত্তিতে ন্যায্য দাবী যার স্বীকৃতি মেলে তাই অধিকার।

মানবাধিকার :মানবাধিকার হচ্ছে মর্যাদার দাবী। অর্থাৎ, জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত মানুষের মর্যাদা নিয়ে বেঁচে থাকার অধিকারই হচ্ছে মানবাধিকার। অপর কথায় যে অধিকার সহজাত, সার্বজনীন, অহস্তান্তরযোগ্য এবং অখণ্ডনীয় তাই মানবাধিকার।

মৌলিক অধিকার:যে অধিকারগুলো সংবিধানে স্বীকৃত এবং আদালতের মাধ্যমে কার্যকরযোগ্য তাই মৌলিক অধিকার। প্রকৃত অর্থে সব মৌলিক অধিকার মানবাধিকার কিন্তু সকল মানবাধিকার মৌলিক অধিকার নয়।

মানবাধিকার	মৌলিক অধিকার
• ব্যাপক ধারণা।	• মানবাধিকারের অংশ বিশেষ।
• মানুষের সহজাত অধিকার।	• সংবিধান স্বীকৃত অধিকার।
• সকল মানবাধিকারের বাস্তবায়ন আদালতের মাধ্যমে সম্ভব নয়।	• আদালতের মাধ্যমে বলবৎ যোগ্য।

• সার্বজনীন, ভৌগোলিক সীমারেখা দ্বারা আবদ্ধ নয়।	• ভৌগোলিক সীমারেখা দ্বারা আবদ্ধ।

পাঠ উপকরণ-২

অধিকার (Rights)

অধিকার হচ্ছে মানুষের আত্মবিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধার দাবি, বা স্বার্থ যা নৈতিক অথবা আইনগত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। আইন বিজ্ঞানী সেমন্ড খুব সহজ করে বলেছেন **'আমার জন্য অন্যদের যা করতে হবে সেটাই আমার অধিকার'**।

আইন থেকে অধিকারের সৃষ্টি হয় না। সমাজে মানুষের পারস্পরিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার মধ্য দিয়ে অধিকারের জন্ম হয়। সমস্ত অধিকারের উদ্ভব নৈতিকতা থেকে। অর্থাৎ আইন কর্তৃক স্বীকৃত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত এটা থাকে নৈতিকতা। সাধারণ ভাষায় অধিকার বলতে আমরা বুঝি সম্পর্কের ভিত্তিতে কিছু ন্যায্য দাবি যা স্বীকৃতিপ্রাপ্ত। সুতরাং অধিকারের কয়েকটি ধাপ হলো-

সম্পর্ক - ন্যায্য দাবি - স্বীকৃতি =অধিকার

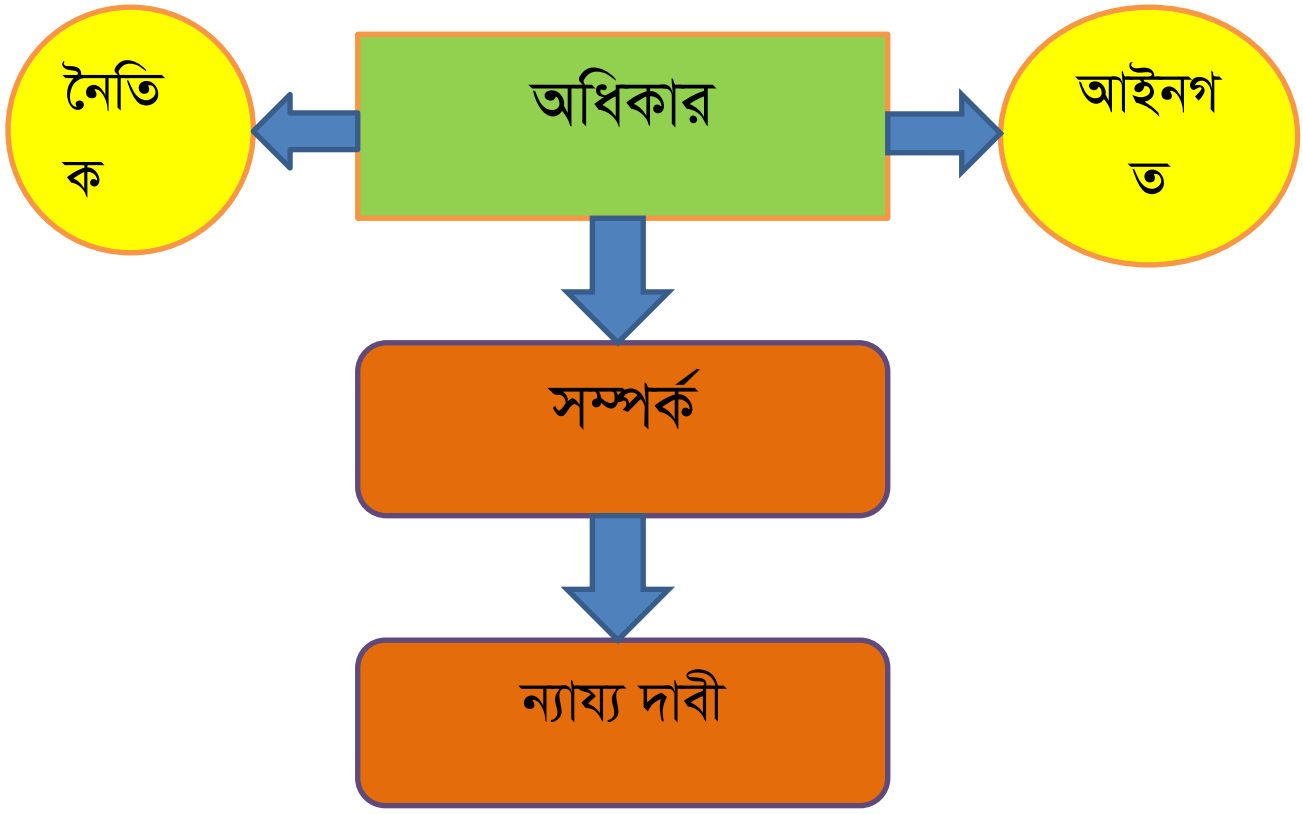

স্বীকৃতি

মানবাধিকার ও এর বৈশিষ্ট্য

মানবাধিকার কথাটি বিশ্লেষণ করলে মানব ও অধিকার এই দুটো শব্দ পাওয়া যায়। একজন মানুষের জীবন, স্বাধীনতা ও নিরাপত্তার জন্য যে অধিকারগুলোর প্রয়োজন তাই মানবাধিকার। একজন মানুষ যদি মানুষ হিসেবে বেঁচে থাকতে চায় তাহলে তার যেমন জীবন প্রয়োজন, তেমনি সে মানুষটি যেন শান্তিতে বসবাস করতে পারে, স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতে পারে তার জন্য স্বাধীনতা ও নিরাপত্তার প্রয়োজন।

অন্যদিকে সে মানুষটির আচার-আচরণ, চলাফেরা অন্যের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতে পারে না। তাই খাদ্যের অধিকার, আশ্রয়ের অধিকার, আইনের আশ্রয় লাভের অধিকার, মতামত প্রকাশের অধিকার, স্বাধীনভাবে সমাবেশ করার অধিকার মানবাধিকার বলে স্বীকৃত। অন্যভাবেও বলা যায়, জন্মগ্রহণের সাথে সাথে মানুষ তার ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য যে অধিকারগুলো ভোগ করার মর্যাদা লাভ করে সেগুলোই মানবাধিকার। ১৯৪৮ সালে গৃহীত সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণাপত্রে এরকম ২৫টি মানবাধিকারের উল্লেখ রয়েছে।

মানবাধিকার কিছু অন্তর্নিহিত নীতিমালা দ্বারা স্বীকৃত ও সংরক্ষিত। যেমন- মানবাধিকারগুলো ভোগ ও চর্চার ক্ষেত্রে সকল মানুষ জন্মগতভাবেই স্বাধীন। মর্যাদা ও অধিকারের দিক থেকেও সবাই সমান- নারী ও পুরুষের কোন ভেদাভেদ নেই। সমতা ও বৈষম্যহীনতার এই মূল্যবোধ পৃথিবীর সকল অঞ্চলেই অনুসরণ করা হয়। মানবাধিকারের মূলকথা হলো জনধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গ, ভাষা, গোত্র, রাজনৈতিক ও অন্যান্য মতাদর্শের ভিত্তিতে মানবাধিকার ভোগ ও চর্চার ক্ষেত্রে কোনোরূপ বৈষম্য করা যাবে না এবং এ অধিকারগুলো কেউ ছিনিয়ে নিতে পারবে না বা সমর্পন করতে পারবে না। একটা গাছের গঠন, আকৃতিও ফল দেখে সেই গাছ

সম্পর্কে আমরা যেমন ধারণা করতে পারি, তেমনি নিম্নলিখিত কিছু বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে মানবাধিকারগুলোকে সহজেই চিহ্নিত করতে পারি।

১। সহজাত:

কেবল মানব শিশু হিসেবে জন্ম নেওয়ার কারণেই যে সকল অধিকার তার জীবন, স্বাধীনতা ও নিরাপত্তার জন্য অপরিহার্য হয়ে পড়ে, সে অধিকারগুলো কোনো কর্তৃপক্ষ দান অথবা খর্ব করতে পারে না অর্থাৎ এ অধিকারগুলো নিয়েই মানুষ জন্মায়।

২। সর্বজনীন:

মানবাধিকার নারী-পুরুষ, ধর্ম, বর্ণ এবং ভৌগোলিক সীমারেখা নির্বিশেষে সকল মানুষের জন্য প্রযোজ্য।

৩। অখন্ডনীয়:

মানবাধিকারের তিনটি মৌলিক উপাদান জীবন, স্বাধীনতা ও নিরাপত্তা কখনোই আলাদা আলাদা প্রদান করা যায় না। এগুলো সবসময় একত্রে প্রদান করতে হয়।

৪। আন্তঃনির্ভরশীল:

মানবাধিকারের তিনটি মৌলিক উপাদান জীবন, স্বাধীনতা ও নিরাপত্তা একে অপরের সাথে নির্ভরশীল। তাই, মানুষের সকল নাগরিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক অধিকারগুলোকে একক এবং অবিভাজ্য হিসেবে গণ্য করতে হবে।

৫। অহস্তান্তরযোগ্য:

মানবাধিকারগুলোকে হস্তান্তর করা যায় না। মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্রে মানবাধিকারের উপরোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলো উল্লেখ করা হয়েছে। মানবাধিকারের বৈশিষ্ট্যের দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, “সকল অধিকারই মানবাধিকার নয়”। যদিও সকল অধিকার মানুষের জন্য তৈরী হয়। মানবাধিকার হলো এমন সব অধিকার যা মানুষ সহজাতভাবে জন্মসূত্রে অর্জন করে। এগুলো কোন দেশ বা কালের সীমানায় আবদ্ধ নয়। এ অধিকারগুলো চিরন্তন ও সর্বজনীন। এগুলো অহস্তান্তরযোগ্য ও অখন্ডনীয়। কারণ এ অধিকারগুলো ছাড়া মানুষ মর্যাদাপূর্ণভাবে বেঁচে থাকতে পারে না।

মানবাধিকারের মূলনীতিসমূহ

সমতা

সমতা বলতে সকল মানুষের সহজাত মর্যাদার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের ধারণাকে বুঝায়। যেমন- সার্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণার ১ম অনুচ্ছেদে সমতাকে মানবাধিকারের ভিত্তি হিসেবে গণ্য করে বলা হয়েছে যে, সকল মানুষ জন্মগতভাবে স্বাধীন এবং মর্যাদা ও অধিকারের দিক দিয়ে সমান।

সর্বজনীনতা

কিছু নির্দিষ্ট নৈতিক মূল্যবোধ পৃথিবীর সকল অঞ্চলেই অনুসরণ করা হয়। সরকার এবং সম্প্রদায় সমূহেরও উচিত এসব মূল্যবোধকে স্বীকৃতি দান ও সমুন্নত রাখতে সচেষ্ট হওয়া। যদিও অধিকারের সার্বজনীনতা বলতে এটা বুঝায় না যে, অধিকারের ধরন পরিবর্তন হবে না বা অধিকারের ব্যাপারে সকল মানুষের অভিজ্ঞতা একই রকম হবে।

মানবিক মর্যাদা

মানবাধিকারের মূলনীতিগুলো যেসব ধারণার ওপর প্রতিষ্ঠিত সেগুলোর অন্যতম হচ্ছে মানবিক মর্যাদা। প্রত্যেক ব্যক্তি বয়স, সংস্কৃতি, বিশ্বাস, গোত্র, বর্ণ, লিঙ্গ, যৌন পরিচয়, ভাষা, সামাজিক শ্রেণি ইত্যাদি নির্বিশেষে সমান মর্যাদা ও সম্মানের অধিকারী।

বৈষম্যহীনতা

বৈষম্যহীনতা সমতার ধারণার এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। বৈষম্যহীনতার ধারণা সমাজে কোনো বাহ্যিক উপদানের কারণে কারো যেন মানবাধিকার লংঘিত না হয় সে বিষয়ে নিশ্চয়তা দেয়। আন্তর্জাতিক মানবাধিকার বিষয়ক দলিলসমূহে যে সব উপদানগুলোকে বৈষম্যের ভিত্তি হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলো হলোগোত্র, বর্ণ, লিঙ্গ, ভাষা, ধর্ম, রাজনৈতিক ও অন্যান্য মতাদর্শ, জাতীয় কিংবা সামাজিক উৎপত্তি, সম্পত্তি, জন্ম অথবা অন্যান্য পদ মর্যাদা। যদিও আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দলিলগুলোতে বৈষম্যের নির্দিষ্ট কিছু উপাদানের কথা বলা হয়েছে, তবে এর মানে এই নয় যে অন্যান্য উপাদানের ভিত্তিতে বৈষম্য করা - মানবাধিকারের পরিপন্থী নয়।

অবিভাজ্যতা

মানবাধিকারের বিভিন্ন শ্রেণিকে অবিভাজ্য হিসেবে বিবেচনা করতে হবে। নাগরিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক কিংবা অপরাপর সকল সামষ্টিক অধিকারগুলোকে একক এবং অবিভাজ্য হিসেবে গণ্য করতে হবে।

অহস্তান্তরযোগ্যতা

মানবাধিকারগুলোকে ছিনিয়ে নেওয়া বা সমর্পন বা হস্তান্তর করা যায় না। কেননা মানবাধিকারের অন্যতম একটি মূলনীতি হচ্ছে এগুলো অহস্তান্তরযোগ্য।

আন্তঃনির্ভরশীলতা

মানবাধিকারের বিষয়গুলো জীবনের সর্বক্ষেত্রেই বিকশিত হয়ে থাকে যেমন- বাড়িতে, স্কুলে, কর্মক্ষেত্রে,আদালতে, বাজারে সর্বত্রই। মানবাধিকার লংঘনের বিষয়গুলো একে অপরের সাথে আন্তঃসম্পর্কীয়।যেমন - একজনের অধিকার লঙ্ঘন অপরের অধিকারের ক্ষতি সাধন করে। একইভাবে কোনো এলাকায় মানবাধিকারের অগ্রগতি অন্য এলাকায়ও অনুরূপ ইতিবাচক প্রভাব সৃষ্টি করে।

দায়িত্বশীলতা

মানবাধিকারের প্রতি দায়িত্বশীলতা- মানবাধিকারের মূলনীতিসমূহের অন্যতম। এ দায়িত্বশীলতা যেমন সরকার এবং ব্যক্তির, তেমনি সমাজের অপরাপর প্রতিষ্ঠানেরও রয়েছে।

সরকারের দায়িত্ব

মানবাধিকার সরকারের খেয়ালীপনার উপর নির্ভরশীল কোনো করুণার বিষয় নয়। এটা এমন ও নয় যে, সরকার কিছু সংখ্যক মানুষের মানবাধিকার রক্ষার চেষ্টা করবে আর অন্য মানুষদের কথা ভাববে না। যদি সরকার তাই করে তবে সে সরকার অবশ্যই মানবাধিকার লংঘনের জন্য দায়ী হবে।

ব্যক্তিগত দায়িত্ব

প্রত্যেক ব্যক্তিরই দায়িত্ব হচ্ছে- মানবাধিকার সম্পর্কে জানা, মানবাধিকারের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা এবং কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান মানবাধিকার লঙ্ঘন করলে তাকে বা সে প্রতিষ্ঠানকে চ্যালেঞ্জ করা।

অপরাপর দায়িত্বশীল সংস্থা

সমাজের সকল শাখা যেমন কর্পোরেশন, বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা, ফাউন্ডেশন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ কেও মানবাধিকার রক্ষা ও উন্নয়ন সাধনে অংশগ্রহণ করতে হবে।

মানবাধিকারের ইতিহাস

মানবতা প্রতিষ্ঠার সুদীর্ঘ সংগ্রামই মানবাধিকারের ইতিহাস। মানবিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্য নিরন্তর সংগ্রাম করে চলেছে মানুষ। এসব সংগ্রামী মানুষের রক্তদানেই লেখা হয়েছে মানবাধিকারের ইতিহাস।

আদি গ্রন্থ

কোরআন, হাম্বুরাব্বি কোড এবং বাইবেল পৃথিবীর অন্যতম প্রাচীন তিনটি গ্রন্থ। এই তিনটি গ্রন্থেই মানুষের অধিকার ও দায়-দায়িত্বের কথা বলা হয়েছে। তাই এই তিনটি গ্রন্থকে মানবাধিকারের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উৎস হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

সিংহরাজের আমল

সর্ব প্রথম যে আইনে মানুষের অধিকারের কথা বলা হয় তা হলো সিংহরাজ্যের আমলে প্রশান্ত মহাসাগরীয় ব-দ্বীপ আইবেরিয়ায় প্রণীত আইন। সামন্ত প্রভু ও অভিজাত শ্রেণীর প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে সিংহরাজের একটি সভা ছিল। ১১৮৮ সালে এই সভা রাজার নিকট থেকে অভিজাত শ্রেণীর জন্য কিছু অধিকার আদায় করে নেয়। যেমন- ব্যক্তি স্বাধীনতা, জীবনের নিরাপত্তা, বাসস্থান ও সম্পদের নিরাপত্তা ইত্যাদি।

স্বর্ণ আদেশ

এরপর ১২২২ সালে হাঙ্গেরীর রাজা দ্বিতীয় এন্ড্রু আমীর-ওমরাহ ও অভিজাত শ্রেণীর জন্য বেশ কিছু অধিকার সংরক্ষণের ঘোষণা দেন। মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তার এ আদেশ অত্যন্ত ইতিবাচক বলে তার ঘোষণা ‘স্বর্ণ আদেশ’ নামে অভিহিত হয়। রাজা এন্ড্রু এ অধিকারগুলোর একটা তালিকা প্রণয়ন করে সেগুলো

কার্যকর করার ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। অধিকারগুলো যেমন; কোন আমিরকে আইনানুগভাবে অভিযুক্ত করা ব্যতীত আটক বা হত্যা করা যাবে না।

রোমান সমাজ

আইবেরিয়ান ব-দ্বীপ বা হাঙ্গেরীতে মানুষের যে অধিকারগুলো দেয়া হয়েছিল সেগুলো ছিল সামন্ত প্রভু বা আমীর ওমরাদের মত উচ্চবিত্ত শ্রেণীর জন্য সেখান থেকে অধিকারগুলো ধীরে ধীরে সাধারণ নাগরিকদের পর্যায়ে নেমে আসে গণপ্রজাতন্ত্রী রোমে। রোমান সমাজে যেগুলো মানুষের অধিকার হিসেবে স্বীকৃত ছিল তার প্রকাশ ও প্রতিফলন দেখা যায় ম্যাগটাকার্টায়।

ইংল্যান্ডে মানবাধিকার বিকাশ

ম্যাগনাকার্টা

মানবাধিকারের ইতিহাসে ম্যাগনাকার্টাকে সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ 'মাইলফলক' হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। এটি ছিল ইংল্যান্ডের রাজা জন এবং ভূ-সম্পদশালী ব্যারনদের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তি। ১২১৫ সালে প্রণীত ম্যাগনাকাটায় বিধান রাখা হয়েছিল যে, গ্রেট কাউন্সিল (জনগন, কর্তৃক নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কাউন্সিল) এর পূর্ব অনুমতি ছাড়া ইচ্ছেমত জনগণের ওপর কর আরোপ করা যাবে না। রাজকর্মকর্তারা যথেচ্ছভাবে জনগণের ভূ-সম্পত্তি অধিগ্রহণ করতে পারবে না এবং ব্যবসায়ীরা গোটা রাজ্যে ইচ্ছামত একস্থান থেকে অন্য স্থানে চলাফেলা করতে পারবে। জুরির মাধ্যমে বিচারের বিধানও ম্যাগনাকার্টায় উল্লেখযোগ্য।

যদিও ম্যাগনাকাটা প্রণয়নের প্রাথমিক উদ্দেশ্য ছিল রাজার বৈষম্যমূলক ও অনৈতিক আচরণ থেকে ব্যারণদের রক্ষা করা, কিন্তু পরবর্তীতে এ অধিকারগুলো সাধারণ মানুষও ভোগ করতে শুরু করে। ম্যাগনাকার্টার ৩৯ অনুচ্ছেদে বলা হয়, কোন স্বাধীন মানুষকে উপযুক্ত বিচার ছাড়া গ্রেফতার, কারাবন্দি বা সম্পত্তিচ্যুত করা যাবে না। এ কারণেই ৬৩টি অনুচ্ছেদ সম্বলিত ম্যাগনাকার্টা, যা ব্যারনদের জন্য প্রণীত হয়েছিল তা পরবর্তীতে 'চার্টার অব ইংলিশ লিবার্টিজ' হিসেবে পরিচিত লাভ করে।

পিটিশন অব রাইটস্

এরপর ১৬২৮ সালে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে পিটিশন অব রাইটস্ গৃহীত হয়। যারা এটি পার্লামেন্টে উত্থাপন করেন তারা তা ইচ্ছা করেই এটি বিল আকারে উত্থাপন না করে পিটিশন হিসেবে উত্থাপন করেন। কারণ বিল আকারে উত্থাপন করলে এতে রাজার সম্মতি প্রয়োজন হোত। আর রাজা যদি সম্মতির পরিবর্তে রয়্যাল ভেটো

দিয়ে ফেলতেন তাহলে এটি আর পাশ হতো না। তাই তারা এটি পিটিশন আকারে উত্থাপন করেন এবং রাজাকে বোঝান যে তারা রাজকীয় দয়া প্রার্থনা করছেন। পিটিশন অব রাইটস্ জনগণকে দিয়েছিল সামরিক আইনের হাত থেকে মুক্তি, পার্লামেন্টের সম্মতি ছাড়া করারোপ না করার নিশ্চয়তা এবং যথেচ্ছ আটক ও বাসস্থানে স্বেচ্ছাচারী অনুপ্রবেশ থেকে রেহাই।

বিল অব রাইটস্

এর ৬০ বছর পর ১৬৮৮ সালে যখন রাজা দ্বিতীয় জেমসের পতন ঘটে তখন ইংরেজী বিপ্লবীরা বিপ্লবের ফলকে চিরস্থায়ী করার জন্য এবং আবার যেন কোন স্বেচ্ছাচারী শাসক ক্ষমতা দখল করতে না পারে সেজন্য পার্লামেন্টে বিল অব রাইটস্ পাশ করে। এই বিল অব রাইটস্ ব্রিটিশ সংবিধানের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দলিল। ফরাসী দার্শনিক ভলতেয়ার বলেছেন, "এই দলিল মানুষকে সেই প্রাকৃতিক অধিকারগুলো ফিরিয়ে দিয়েছে যেগুলো থেকে তারা ছিল যুগ যুগ ধরে বঞ্চিত"। অধিকারগুলো হলো জীবন ও সম্পত্তির স্বাধীনতা, লেখনী দ্বারা মত প্রকাশের অধিকার, স্বাধীন লোকদের দ্বারা গঠিত জুরী ছাড়া অন্য কারো দ্বারা অভিযুক্ত না হবার স্বাধীনতা এবং শান্তিপূর্ণ ভাবে যে কোন ধর্ম পালনের স্বাধীনতা। শুধু তাই নয় বিল অব রাইটস্ এটাও ঘোষণা করে যে, পার্লামেন্টের পূর্ব অনুমতি ছাড়া রাজা যদি কোন আইন ভঙ্গ বা স্থগিত করেন, জনগণের ওপর কর আরোপ করেন কিংবা ইচ্ছামত রাজ আদালত গঠন করেন এবং শান্তিকালীন সময়ে সেনাবাহিনীর কলেবর বৃদ্ধি করেন তবে সেগুলো হবে বেআইনী ও ধ্বংসাত্মক কাজ।

ম্যাগনাকার্টা, পিটিশন অব রাইটস্ ও বিল অব রাইটস্ -এই তিনটি দলিল এভাবেই রাজার একচ্ছত্র ক্ষমতা ও আধিপত্যকে সীমিত করে জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত পার্লামেন্ট ও আদালতকে শক্তিশালী করে। লর্ড চাথান এই তিন দলিলকে 'ব্রিটিশ সংবিধানের বাইবেল' হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন। শুধু ব্রিটিশ সংবিধানেরই নয়, মানবাধিকারের ইতিহাসেও এই তিনটি দলিলের গুরুত্ব অপরিসীম।

আমেরিকায় মানবাধিকার বিকাশ

ভার্জিনিয়া বিল অব রাইটস্

সপ্তদশ শতাব্দীতে আমেরিকা ছিল ব্রিটিশ কলোনী। বিট্রিশ সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে তারা স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু করে। এ সংগ্রামের এক পর্যায়ে ১৭৭৬ সালের ১২ জুন স্বাধীনতা সংগ্রামীরা ভার্জিনিয়া শহরে বসে গ্রহণ করে 'ভার্জিনিয়া বিল অব রাইটস্'। এই বিলে ঘোষণা করা হয় সব মানুষ প্রকৃতিগতভাবে সম্পূর্ণ মুক্ত ও স্বাধীন। তাদের কিছু সহজাত অধিকার আছে। ঘোষণায় সংবাদপত্রের স্বাধীনতাকে স্বাধীনতা রক্ষায় 'মহান বর্ম' হিসাবে অভিহিত করা হয় এবং ঘোষণা করা হয় যে, জনগনই সকল ক্ষমতার উৎস।

ডিক্লারেশন অব ইনডিপেন্ডেন্স

১৭৭৬ সালের ৪ঠা জুলাই আমেরিকার ফিলাডেলফিয়াতে স্বাধীনতার সমর্থনে গৃহীত হয় 'দ্য ডিক্লারেশন অব ইনডিপেনডেন্স'। এই ঘোষণার মুখবন্ধে বলা হয়- সকল মানুষ সমানভাবে সৃষ্ট, সৃষ্টিকর্তা তাদের কিছু অহস্তান্তরযোগ্য অধিকার দিয়েছেন যেমন- জীবন, স্বাধীনতা ও সুখ অন্বেষণের অধিকার।

আমেরিকান বিল অব রাইটস্

আমেরিকার সংবিধান গৃহীত হয় ১৭৮৯ সালে। এই সংবিধানে মানুষের অধিকারসমূহ উল্লেখিত না থাকায় ১৭৯১ সালে এক সাথে ১০টি সংশোধনীর মাধ্যমে বেশ কিছু অধিকার এতে সংযোজিত হয়। এগুলোই হল আমেরিকান বিল অব রাইটস।

ফরাসী বিপ্লব

ফরাসী বিপ্লবের পূর্ব পর্যন্ত বিশ্ব নিয়ন্ত্রিত হয়েছে অভিজাত শ্রেণীর দ্বারা। সে কারণে অধিকার ভোগের ক্ষেত্রেও তারাই অগ্রাধিকার পেয়েছে। কিন্তু ফরাসী বিপ্লবে নেতৃত্ব দেয় মধ্যবিত্ত শ্রেণী। ইংল্যান্ডের বিপ্লব, আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রাম ফ্রান্সের বিপ্লবীদের প্রেরণা যোগায়। রুশো, ভলতেয়ার, মন্টেস্কু প্রমুখ দার্শনিকের লেখনীর মাধ্যমে তা শানিত হয়। ১৭৮৯ সালের ১৪ই জুলাই বাস্তিল দুর্গের পতন হয় এবং স্বৈরাচারী রাজা ক্ষমতাচ্যুত হন। ১৭৮৯ সালের ১৬ আগষ্ট গৃহীত হয় মানুষ ও নাগরিকের অধিকার সংক্রান্ত ফ্রান্স ঘোষণা। এই ঘোষণায় বলা হয় মানুষ স্বাধীন স্বত্তা নিয়ে জন্মগ্রহণ করে এবং তারা স্বাধীন ও সমঅধিকার সম্পন্ন। এ ঘোষণায় যে অধিকারগুলোর কথ বলা হয় তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল স্বাধীনতা, সম্পত্তির অধিকার, নিরাপত্তা প্রাপ্তি ও অন্যায়ের প্রতিবাদ করার অধিকার, অন্যায় আটক থেকে মুক্তির অধিকার, ধর্মীয় স্বাধীনতা, বাক এবং সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ইত্যাদি।

রুশ বিপ্লব

ইংল্যান্ড, আমেরিকা বা ফ্রান্সের বিপ্লব ছিল বুর্জোয়া বিপ্লব বা ধনিক শ্রেণীর বিপ্লব। ফলে তার মাধ্যমে মানবাধিকারের যে বিকাশ ঘটে তাতে গুরুত্ব পায় নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকারসমূহ। কিন্তু ১৯১৭ সালের রুশ বিপ্লবের পর বিশ্ব জুড়ে শ্রমিক শ্রেণীর ক্ষমতায়ন ঘটতে থাকে। শ্রমিক শ্রেণীর কাছে নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকারসমূহের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল শিক্ষা, সামাজিক বিষয়সমূহ, নিরাপত্তা, বিশ্রাম, বিনোদন, স্বয়ং সম্পূর্ণ জীবনযাত্রা, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ, ট্রেড ইউনিয়ন করার মত অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকারসমূহ প্রভৃতি। আর রুশ বিপ্লবের ফলশ্রুতিতেই এ অধিকারগুলো প্রতিষ্ঠা পায়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ছিল মানব ইতিহাসের বর্বরতম অধ্যায়। একদিকে হিটলারের নাৎসী বাহিনীর নৃশংসতা, অন্যদিকে হিরোসিমা ও নাগাসাকিতে আমেরিকার পারমানিবক বোমা নিক্ষেপের মত বর্বর ঘটনায় হতবাক হয়ে যায় বিশ্ববাসী। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে ষোড়শ, সপ্তদশ ও অষ্টদশ শতকে উদ্বেগের বিষয় ছিল ধর্মীয় স্বাধীনতা সংরক্ষণ এবং শ্রমিকদের অধিকার সংরক্ষণ ইত্যাদি। এসবের ব্যাপারে বিভিন্ন পদক্ষেপও নেয়া হয়েছিল, কিন্তু সেগুলো ছিল রাষ্ট্রীয় সীমানার মধ্যে সীমিত। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বিশ্ব নেতৃবৃন্দ উপলব্ধি করেন যে পৃথিবীতে এ ধরণের নৃশংসতা আর ঘটতে দেয়া যায় না। তাছাড়া রাষ্ট্রের নাগরিকরাও যেন রাষ্ট্রীয় নিপীড়ন থেকে মুক্ত থাকতে পারে তারও ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

বিশ্বের সকল জাতিসমূহ বুঝতে পারে যে, মানুষের ব্যক্তি স্বাধীনতার ব্যাপারটি এখন আর শুধু রাষ্ট্রের ইচ্ছার ওপর ছেড়ে দেয়া চলে না এবং বিশ্বে প্রকৃত ও স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য সবার আগে প্রয়োজন বিশ্বের সব মানুষের অধিকার সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা।

জাতিসংঘ গঠন

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতাই বিশ্ববাসীকে ঐক্যবদ্ধ হবার প্রেরণা যুগিয়েছে। এর ফলশ্রুতিতেই বিশ্ববাসীর আন্তরিক উদ্যোগ ও সীমাহীন প্রচেষ্টায় ১৯৪৫ সালের ২৪ অক্টোবর প্রতিষ্ঠিত হয় সম্মিলিত জাতিসংঘ। জাতিসংঘ সনদই হচ্ছে প্রথম আন্তর্জাতিক চুক্তি যাতে বিশ্ব সম্প্রদায় আন্তর্জাতিক পর্যায়ে মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতা উন্নয়নে সম্মত হয়। জাতিসংঘ সনদের প্রস্তাবনায় মানবাধিকার বিষয়ে বলা হয়।

এছাড়া সনদের ৮টি অনুচ্ছেদে মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতার কথা উল্লেখ আছে। জাতিসংঘ সনদের ৬৮ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদকে (Ecosoc) মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতা সংরক্ষণে একটি কমিশন গঠনের ক্ষমতা দেয়া হয়। এই ক্ষমতাবলে Ecosoc ১৯৪৬ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারী গঠন করে মানবাধিকার কমিশন। এই কমিশনকে দায়িত্ব দেয়া একটি আন্তর্জাতিক অধিকারের বিলের খসড়া প্রণয়ন করতে।

১৯৪৭ সালের ডিসেম্বরে জেনেভায় অনুষ্ঠিত জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের দ্বিতীয় অধিবেশনে মানবাধিকার কমিশন সিদ্ধান্ত নেয় যে, ‘আন্তর্জাতিক অধিকারের বিল’- এ তিনটি বিষয় অন্তর্ভুক্ত থাকবে। একটি মানবাধিকার ঘোষণা একটি মানবাধিকার চুক্তি এবং একটি বাস্তবায়ন পদ্ধতি।

সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণা (UDHR)

‘আন্তর্জাতিক অধিকার বিল’ এর তিনটি অংশে প্রথম অংশ হচ্ছে ‘মানবাধিকার ঘোষণা’। এজন্যই এ ঘোষণাকে বলা হয় তিন সোপান বিশিষ্ট রকেটের প্রথম সোপান। তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের স্ত্রী মিসেস এলিয়েনর রুজভেল্টের নেতৃত্বে মানবাধিকার কমিশন তৈরী করে সর্বজনীন মানবাধিকারের ঘোষণা (UDHR)। জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ ১৯৪৮ সালের ১০ ডিসেম্বর এটি গ্রহণ করে। সে সময়

জাতিসংঘের সদস্য সংখ্যা ছিল ৫৮। এর মধ্যে ৪৮টি রাষ্ট্র এ ঘোষণার পক্ষে ভোট দেয়। বাকি ৮টি রাষ্ট্র ভোটদানে বিরত থাকে। সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং সোভিয়েত ব্লকের ৪টি রাষ্ট্র - বেলারুশ, ইউক্রেন চেকোশ্লোভাকিয়া, যুগোশ্লোভিয়া, পোল্যান্ড প্রভৃতি ভোটদানে বিরত থাকে এ যুক্তিতে যে ঘোষণায় অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকারগুলো যথেষ্ট গুরুত্ব পায়নি। এছাড়া সৌদি আরব ও দক্ষিণ আফ্রিকাও ভোটদানে বিরত থাকে। যেহেতু এ ঘোষণার বিপক্ষে কোন রাষ্ট্র ভোট দেয়নি, তাই বলা হয় সর্বজনীন মানবাধিকারের ঘোষণা গৃহীত হয় সর্বসম্মতিক্রমে। মানবাধিকারের ঘোষণার প্রথম অনুচ্ছেদই বলা হয়, 'সকল মানুষ বন্ধনহীন অবস্থায় সম মর্যাদা ও সম অধিকার নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। তাদের বুদ্ধি ও বিবেক রয়েছে এবং তাদের উচিত ভাতৃত্বসূলভ মনোভাব নিয়ে একে অন্যের সাথে আচরণ করা।

এভাবেই দীর্ঘ সংগ্রামের পথ ধরে গৃহীত হয় মানব ইতিহাসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দলিল। সূচনা হয় নতুন দিগন্তের।

সর্বজনীন মানবাধিকারের ঘোষণা

জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ ১৯৪৮ সালের ১০ই ডিসেম্বর পৃথিবীর সকল মানুষের জন্য মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্র পাস করে। এই ঘোষণাপত্রে ৩০টি অনুচ্ছেদ আছে। যার মধ্যে- অনুচ্ছেদ ১ এ মানুষের মর্যাদা ও অধিকার ভোগের ক্ষেত্রে সমতা, অনুচ্ছেদ ২ এ বৈষম্যহীনতা, অনুচ্ছেদ ৩-২৭ পর্যন্ত মানুষের অধিকার এবং ২৮-৩০ অনুচ্ছেদ পর্যন্ত রাষ্ট্র, সমাজ ও ব্যক্তিগত দায়-দায়িত্বের কথা বলা হয়েছে। নিম্নে সংক্ষেপে মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণায় বর্ণিত অধিকারগুলো বর্ণনা করা হলো ঃ

১। **সমতাঃ** সকল মানুষ স্বাধীন অবস্থায় জন্মগ্রহণ করে এবং সমান মর্যাদা ও সমান অধিকার নিয়ে জন্মগ্রহণ করে।

২। **বৈষম্যহীনতাঃ** মানুষের মধ্যে জাতি, ধর্ম, বর্ণ, নারী, পুরুষ, ভাষা, রাজনৈতিক বা অন্য কোন মতবাদ, সামাজিক উৎপত্তি, সম্পত্তি, জন্ম বা অন্য কোন পদমর্যাদা/অবস্থানের কারণে পার্থক্য থাকতে পারে। কিন্তু এই ঘোষণাপত্রে উল্লেখিত অধিকারগুলো ভোগ করার ক্ষেত্রে উপরিউক্ত পার্থক্যগুলোর ভিত্তিতে কোনোরূপ বৈষম্য করা যাবে না।

এমনকি কোনো মানুষের যদি কোনো দেশ থাকুক বা না থাকুক সবাই এই অধিকারগুলো সমানভাবে ভোগ করবে।

৩। **জীবন, স্বাধীনতা ও ব্যক্তিগত নিরাপত্তার অধিকারঃ** প্রত্যেকের জীবন ধারণ, স্বাধীনতা ও ব্যক্তিগত নিরাপত্তা অধিকার রয়েছে।

৪। **দাসত্ব থেকে মুক্তি পাওয়ার অধিকারঃ** কাউকে দাস হিসেবে কিংবা দাসত্বের বন্ধনে রাখা চলবে না। সকল প্রকার দাস-প্রথা ও দাস-ব্যবসা নিষিদ্ধ থাকবে।

৫। **নির্যাতন ও অবমূল্যায়ন থেকে মুক্তির অধিকারঃ** কারো প্রতি নিষ্ঠুর, অমানুষিক বা অবমাননাকর আচরণ করা যাবে না। কাউকে নির্যাতন করা যাবে না। কাউকে নিষ্ঠুর অবমাননাকর অমানুষিক শাস্তি দেওয়া যাবে না।

৬। **আইনের চোখে একজন ব্যক্তি হিসেবে স্বীকৃতি পাওয়ার অধিকারঃ** আইনের কাছে প্রত্যেকেরই সর্বত্র ব্যক্তি হিসেবে স্বীকৃত লাভের অধিকার থাকবে।

৭। **আইনের দৃষ্টিতে সকলে সমান এবং আইনের আশ্রয় সমানভাবে পাওয়ার অধিকারঃ** আইনের কাছে সব মানুষ সমান। কোন রকম বৈষম্য ছাড়া আইন সব মানুষকে সমানভাবে রক্ষা করবে।

৮। **উপযুক্ত আদালত থেকে বিচার পাওয়ার অধিকারঃ** যেসব কাজের ফলে সংবিধান বা অন্যান্য আইন দ্বারা প্রদত্ত মৌলিক অধিকারগুলো লংঘন করা হয় তার জন্য প্রত্যেক দেশে উপযুক্ত আদালত থেকে বিচার ও প্রতিকার লাভের অধিকার থাকবে।

৯। **বেআইনী আটক ও বন্দীদশা থেকে মুক্তি লাভের অধিকারঃ** কাউকে খেয়াল খুশিমত গ্রেফতার বা আটক করা অথবা নির্বাসন দেয়া যাবে না।

১০। **নিরপেক্ষ প্রকাশ্য শুনানীর অধিকারঃ** যদি কোন ফৌজদারী অভিযোগ আনা হয় তবে তাকে একটি স্বাধীন ও নিরপেক্ষ আদালতে প্রকাশ্য ও ন্যায়ভাবে শুনানী লাভের অধিকার দিতে হবে। এরকম আদালতে প্রকাশ্য ও ন্যায্য শুনানী ব্যতিত কাউকে শাস্তি বা দন্ড দেওয়া যাবে না।

১১। **অপরাধ প্রমাণ না হওয়া পর্যন্ত-নির্দোষ ব্যক্তির মত আচরণ পাওয়ার অধিকারঃ** একজন ব্যক্তির দন্ডযোগ্য অপরাধের অভিযুক্ত হলে যতক্ষণ না সে আইন অনুযায়ী আদালতের মাধ্যমে দোষী সাব্যস্ত হয় ততক্ষণ সে নির্দোষ বক্তির মতো আচরণ পাওয়ার অধিকারী। আবার কাউকে এমন কোনো কাজের জন্য দোষী সাব্যস্ত করা যাবে না যে কাজ করার সময় আইন অনুযায়ী তা অপরাধ ছিলো না কিন্তু তা করার পর আইনে তা অপরাধ হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। তাছাড়া অপরাধ করার সময় আইনে অপরাধের যে শাস্তি ছিলো পরে যদি ওই শাস্তি বাড়ানো হয় তবে অপরাধ করার সময় আইনে যে শাস্তি ছিলো অভিযুক্ত ওই শাস্তি পাবে। তার চেয়ে বেশী শাস্তি পাবে না।

১২। **পরিবার, বাড়ীতে এবং পত্র যোগাযোগের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত গোপনীয়তা রক্ষার অধিকারঃ** কারো ব্যক্তিগত গোপনীয়তা, পরিবার, বসতবাড়ী বা চিঠিপত্রের ব্যাপারে খেয়াল-খুশীমত হস্তক্ষেপ করা চলবে না।

১৩। **স্বাধীনভাবে নিজের দেশের যেকোনো স্থানে যাওয়া ও বসতি স্থাপন এবং অন্য দেশে যাওয়া ও ফিরে আসার অধিকারঃ** প্রত্যেকের নিজের দেশের মধ্যে যে কোনো স্থানে যাওয়া আসা ও বসতি স্থাপন করার অধিকার থাকবে। তাছাড়া যে কেউ ইচ্ছা করলে নিজ দেশ বা অন্যকোন দেশ ছেড়ে চলে যেতে পারবে। আবার যদি সে নিজে দেশে প্রত্যাবর্তন করতে চায় তবে তাকে বাধা দেওয়া যাবে না।

১৪। **অমানবিক যন্ত্রণা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য অন্য দেশে রাজনৈতিক আশ্রয় পাওয়ার অধিকারঃ** প্রত্যেকের নিজ দেশে নির্যাতন এড়ানোর জন্য অন্য দেশে রাজনৈতিক আশ্রয়, প্রার্থনা ও লাভ করার অধিকার থাকবে। তবে অরাজনৈতিক অপরাধের ক্ষেত্রে এ ধরণের আশ্রয় লাভের অধিকার নাও পাওয়া যেতে পারে।

১৫। **জাতীয়তা পাওয়া এবং পরিবর্তন করার অধিকারঃ** প্রত্যেক মানুষের নিজ দেশে নাগরিকত্ব লাভ করার অধিকার থাকবে। কাউকে খেয়াল খুশিমতো নাগরিকত্ব থেকে বঞ্চিত করা যাবে না। আবার কেউ তার নাগরিকত্ব পরিবর্তন করতে চাইলে তাকে বাধা দেওয়া যাবে না।

১৬। **বিয়ে করা এবং পরিবার গঠন করার অধিকারঃ** প্রত্যেক নারী পুরুষের জাতিগত বাধা, জাতীয়তার বাধা অথবা ধর্মের বাধা ছাড়া বিয়ে করার ও পরিবার গঠন করার অধিকার থাকবে। বিয়ের ব্যাপারে, বিবাহিত অবস্থায় ও বিবাহ বিচ্ছেদকালে নারী ও পুরুষের সমান অধিকার থাকবে।

১৭। **সম্পত্তির মালিক হওয়ার অধিকাঃ** প্রত্যেকের একাকী ও যৌথভাবে সম্পত্তির মালিক হওয়ার অধিকার রয়েছে। এবং কাউকে খেয়াল খুশীমতো সম্পত্তির অধিকার থেকে বঞ্চিত করা যাবে না।

১৮। **নিজস্ব বিশ্বাস ধর্মের স্বাধীনতার অধিকারঃ** প্রত্যেকেরই চিন্তা, বিবেক ও ধর্মের স্বাধীনতার অধিকার রয়েছে, তাই প্রত্যেকের যেমন- নিজ ধর্ম ও বিশ্বাস পালন করার স্বাধীনতা রয়েছে তেমনি তা পরিবর্তনেরও অধিকার রয়েছে। প্রত্যেকে প্রকাশ্যে বা গোপনে নিজ ধর্ম বা বিশ্বাস শিক্ষাদান ও প্রচার করতে পারবে।

১৯। **মতামত দেয়া ও তথ্য পাওয়ার স্বাধীনতার অধিকারঃ** প্রত্যেকের মতামত পোষণ করা ও প্রকাশ করার অধিকার আছে। এক্ষেত্রে কোনো হস্তক্ষেপ করা যাবে না। এছাড়া প্রত্যেকে রাষ্ট্রীয় সীমার মধ্যে ও বাইরে তথ্য ও মতামত সজ্ঞান করা ও গ্রহণ করা ও জানাতে পারবে।

২০। **শান্তিপূর্ণভাবে সমাবেশ ও সংগঠন করার অধিকারঃ** প্রত্যেকের শান্তিপূর্ণভাবে সমাবেশ করা ও সংঘ গঠন করার অধিকার আছে। তবে কাউকে কোন সঙ্গভুক্ত হতে বাধ্য করা যাবে না।

২১। **মুক্ত নির্বাচন ও সরকারে অংশগ্রহণের অধিকারঃ** প্রত্যেকের প্রত্যক্ষ ও অবাধ নির্বাচন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে প্রতিনিধি নির্বাচনের মাধ্যমে সরকারে অংশগ্রহণের অধিকার রয়েছে। তাছাড়া নিজ দেশের সরকারী চাকুরী লাভের ক্ষেত্রে প্রত্যেকে সমান সুযোগ লাভের অধিকারী।

২২। **সামাজিক নিরাপত্তার অধিকারঃ** সমাজের সদস্য হিসেবে প্রত্যেকেরই সামাজিক নিরাপত্তার অধিকার রয়েছে। এজন্য জাতীয় প্রচেষ্টা ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতা লাভের মাধ্যমে নিজ রাষ্ট্রে সংগঠন ও সম্পদ অনুযায়ী প্রত্যেকেই তার মর্যাদা ও ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্য অপরিহার্য অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকারগুলো ভোগ করবে।

২৩। **কাঙ্খিত কাজ পাওয়া ও ট্রেড ইউনিয়ন করার অধিকারঃ** প্রত্যেকের কাজ করার ও চাকুরী পছন্দ করার অধিকার রয়েছে। তাছাড়া প্রত্যেকের কাজের জন্য ন্যায্য ও অনুকূল পরিবেশ/ অবস্থা লাভ করার ও বেকারত্ব থেকে রক্ষা পাওয়ার অধিকার আছে। প্রত্যেকে সমান সমান কাজের জন্য সমান সমান মজুরী পাবে। প্রত্যেকের নিজ স্বার্থ রক্ষা করার জন্য শ্রমিক ইউনিয়ন গঠন ও এতে যোগদানের অধিকার রয়েছে।

২৪। **অবসর ও বিশ্রাম পাওয়ার অধিকারঃ** প্রত্যেকেরই বিশ্রাম ও অবসর বিনোদনের অধিকার আছে। কাজের সময়ের যুক্তিসংগত সীমা ও বেতনসহ নৈমিত্তিক ছুটি এ অধিকারের অন্তর্ভুক্ত।

২৫। পর্যাপ্ত **জীবন-যাত্রার/ স্বয়ং সম্পূর্ণ মানের অধিকার ঃ** খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা ও প্রয়োজনীয় সেবামূলক কাজের সুবিধা লাভের মাধ্যমে প্রত্যেকের নিজের ও নিজের পরিবারের স্বাস্থ্য কল্যাণের জন্য উপযুক্ত জীবন যাত্রার মানের অধিকার আছে। বেকারত্ব, পীড়া, অক্ষমতা, বৈধব্য, বার্ধক্য অথবা অন্যান্য অনিবার্য কারণে জীবন যাপনে অন্যান্য অপারগতার ক্ষেত্রে নিরাপত্তার অধিকার থাকবে, মাতৃত্বও শিশু অবস্থায় প্রত্যেকে বিশেষ যত্ন ও সহায়তা ভোগ করবে। প্রত্যেক শিশুর অভিন্ন সামাজিক নিরাপত্তা ভোগ করবে তাই সে বৈবাহিক বন্ধনের ফলে বা বৈবাহিক বন্ধন ছাড়া জন্মগ্রহণ করুক।

২৬। **শিক্ষার অধিকারঃ** প্রত্যেকের শিক্ষা লাভের অধিকার আছে। অন্ততপক্ষে প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক হবে। কারিগরী ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা সবার জন্য উন্মুক্ত থাকবে। উচ্চতর শিক্ষা মেধার ভিত্তিতে সকলের জন্য উন্মুক্ত থাকবে। শিক্ষার উদ্দেশ্য হবে ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশ এবং মানবাধিকার ও মৌলিক অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ দৃঢ় করা।

২৭। **সাংস্কৃতিক জীবনে অবাধে অংশগ্রহণের অধিকারঃ**কপিরাইট হচ্ছে একটি বিশেষ আইন যা কোন ব্যক্তির উদ্ভাবিত, সৃজনশীল কাজ বা সাহিত্য কর্মকে সুরক্ষা করে যাতে অন্য কেউ বিনা অনুমতিতে তা প্রকাশ, প্রকাশনা বা ব্যবহার করতে না পারে। প্রত্যেকের গোষ্ঠীগত সাংস্কৃতিক জীবনে অবাধে অংশগ্রহণ করা ও শিল্প কলা চর্চা করার অধিকার রয়েছে।

২৮। **মানবাধিকার রক্ষাকল্পে আন্তর্জাতিক ও সামাজিক ব্যবস্থার নিশ্চয়তাঃ** প্রত্যেকে এমন একটি সামাজিক ও আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার অধিকারী যেখানে এই ঘোষণাপত্রে উল্লেখিত অধিকার ও স্বাধীনতাগুলো পূর্ণভাবে আদায় করা যায়।

২৯। **অপরের অধিকার ও স্বাধীনতার প্রতি অস্বীকৃতি ও অশ্রদ্ধা প্রকাশ না করে এই অধিকারগুলো ভোগ করার নিশ্চয়তাঃ** নিজের অধিকার ও স্বাধীনতা ভোগ করার সময় প্রত্যেকের মনে রাখতে হবে যে, তাতে যেন অন্যের অধিকার ও স্বাধীনতাগুলো খর্ব না হয় বা এ বিষয়ে কোনো অশ্রদ্ধা বা অস্বীকৃতি প্রকাশ না পায়, অধিকন্তু একটি গণতান্ত্রিক সমাজে নৈতিকতা, গণশৃংখলা ও সর্ব সাধারণের কল্যাণের দিকে লক্ষ্য রেখে এবং আইন মান্য করেই প্রত্যেকে তার অধিকার ও স্বাধীনতা প্রয়োগ করবে।

৩০। **উপরিউক্ত অধিকারগুলোর ব্যাপারে রাষ্ট্র, দল ও ব্যক্তির হস্তক্ষেপ না করাঃ** এই ঘোষণার ব্যাখ্যা করার ক্ষেত্রে এর অন্তর্ভুক্ত কোনো অধিকার বা স্বাধীনতা ক্ষুণ্ন করার অধিকার কোনো রাষ্ট্র দল বা ব্যক্তি বিশেষের আছে এমন ধারণা করার মতো কোনো ব্যাখ্যা দেয়া চলবে না।

এক নজরে ২৫টি অধিকার

জীবন, স্বাধীনতা ও ব্যক্তিগত নিরাপত্তার অধিকার	দাসত্ব থেকে মুক্তি পাওয়ার অধিকার	নির্যাতন ও অবমূল্যায়ন থেকে মুক্তির অধিকার	আইনের চোখে একজন ব্যক্তি হিসেবে স্বীকৃতি পাওয়ার অধিকার	আইনের দৃষ্টিতে সকলে সমান এবং আইনের আশ্রয় সমানভাবে পাওয়ার অধিকার

উপযুক্ত আদালত থেকে বিচার পাওয়ার অধিকার	বেআইনী আটক ও বন্দীদশা থেকে মুক্তি লাভের অধিকার	নিরপেক্ষ প্রকাশ্য শুনানীর অধিকার	অপরাধ প্রমাণ না হওয়া পর্যন্ত নির্দোষ ব্যক্তির মত আচরণ পাওয়ার অধিকার	পরিবার, বাড়ীতে এবং পত্র যোগাযোগের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত গোপনীয়তা রক্ষার অধিকার
স্বাধীনভাবে নিজের দেশের যেকোনো স্থানে যাওয়া ও বসতি স্থাপন এবং অন্য দেশে যাওয়া ও ফিরে আসার অধিকার	অমানবিক যন্ত্রণা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য অন্য দেশে রাজনৈতিক আশ্রয় পাওয়ার অধিকার	জাতীয়তা পাওয়া এবং পরিবর্তন করার অধিকার	বিয়ে করা এবং পরিবার গঠন করার অধিকার	সম্পত্তির মালিক হওয়ার অধিকার
নিজস্ব বিশ্বাস ধর্মের স্বাধীনতার অধিকার	মতামত দেওয়া ও তথ্য পাওয়ার স্বাধীনতার অধিকার	শান্তিপূর্ণভাবে সমাবেশ ও সংগঠন করার অধিকার	মুক্ত নির্বাচন ও সরকারে অংশগ্রহণের অধিকার	সামাজিক নিরাপত্তার অধিকার

বাংলাদেশের সংবিধানে বর্ণিত মৌলিক অধিকারসমূহ

এই সংবিধানের তৃতীয়ভাগে ২৬ থেকে ৪৪ পর্যন্ত মোট ১৯টি অনুচ্ছেদে বাংলাদেশের জনগণের জন্য ১৮টি মৌলিক অধিকার সন্নিবেশ করা হয়েছে।

এই অধিকারগুলোর পরিপন্থী কোনো আইন পাশ করা যাবে না; যদি পাশ করা হয় তাহলে তা বাতিল বলে গণ্য হবে।

নিম্নে সংক্ষেপে সংবিধানে বর্ণিত মৌলিক অধিকারসমূহ উল্লেখ করা হলো:

- সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান এবং আইনের সমান আশ্রয় লাভের অধিকারী (অনু: ২৭)।
- ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী-পুরুষভেদে বা জন্মস্থানের কারণে কোন নাগরিকের প্রতি রাষ্ট্র কোনো বৈষম্য করবে না (অনু: ২৮)।
- কর্মে নিয়োগ বা পদ লাভের ক্ষেত্রে সকল নাগরিকের সমান সুযোগ থাকবে (অনু: ২৯)।

- রাষ্ট্রপতির পূর্বানুমতি ব্যতীত কেউ কোনো বিদেশী রাষ্ট্রের নিকট থেকে কোন উপাধি, সম্মান, পুরস্কার গ্রহণ করতে পারবে না (অনু: ৩০)।
- আইনানুযায়ী ব্যতীত এমন কোনো ব্যবস্থা কারও প্রতি গ্রহণ করা যাবে না যাতে কোন ব্যক্তির জীবন, স্বাধীনতা, দেহ, সুনাম বা সম্পত্তির হানি ঘটে (অনু: ৩১)।
- আইনানুযায়ী ব্যতীত জীবন ও ব্যক্তি স্বাধীনতা হতে কোনো ব্যক্তিকে বঞ্চিত করা যাবে না (অনু: ৩১)।
- গ্রেফতারকৃত যে কোনো ব্যক্তিকে যথাসম্ভব শীঘ্র গ্রেফতারের কারণ জানাতে হবে এবং তার মনোনীত আইনজীবীর সাথে পরামর্শ ও তাঁর মাধ্যমে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দিতে হবে (অনু: ৩৩)।
- জোরপূর্বক কাউকে শ্রমদানে বাধ্য করা যাবে না (অনু: ৩৪)।
- কোনো ব্যক্তিকে যন্ত্রণা দেয়া যাবে না কিংবা নিষ্ঠুর, অমানুষিক বা লাঞ্ছনাকর দণ্ড দেয়া যাবে না (অনু: ৩৫)।
- বাংলাদেশের সর্বত্র অবাধ চলাফেরা, এর যে কোনো স্থানে বসবাস ও বসতি স্থাপন এবং বাংলাদেশ ত্যাগ ও পুনঃ প্রবেশ করার অধিকার প্রত্যেক নাগরিকের থাকবে (অনু: ৩৬)।
- শান্তিপূর্ণভাবে ও নিরস্ত্র অবস্থায় সমবেত হওয়া এবং জনসভা ও শোভাযাত্রায় যোগদানের অধিকার প্রত্যেক নাগরিকের থাকবে (অনু: ৩৭)।
- সমিতি, সংগঠন বা সংঘ গড়ে তোলার অধিকার প্রত্যেক নাগরিকের থাকবে (অনু: ৩৮)।
- প্রত্যেক নাগরিকের বাক ও ভাব প্রকাশের স্বাধীনতা এবং সংবাদপত্রের স্বাধীনতা নিশ্চয়তা দেওয়া হল (অনু: ৩৯)।
- যেকোনো আইনসংগত পেশা বা বৃত্তি গ্রহণের অধিকার প্রত্যেক নাগরিকের থাকবে (অনু: ৪০)।
- যেকোনো ধর্ম অবলম্বন, পালন বা প্রচারের অধিকার প্রত্যেক নাগরিকের রয়েছে (অনু: ৪১)।
- প্রত্যেক নাগরিকের সম্পত্তি অর্জন, ধারণ, হস্তান্তর বা অন্যভাবে বিলি ব্যবস্থা করার অধিকার থাকবে (অনু: ৪২)।
- স্বীয় গৃহে নিরাপত্তা লাভ ও যোগাযোগের অন্যান্য উপায়ের গোপনীয়তা রক্ষার অধিকার প্রত্যেকের থাকবে (অনু: ৪৩)।
- উপরোক্ত অধিকারসমূহ বলবৎ করার জন্য হাইকোর্ট বিভাগে মামলা দায়ের করার অধিকার প্রত্যেকের থাকবে (অনুঃ ৪৪)।

পাঠ উপকরণ-৩

বৈষম্য

মানবাধিকার এর স্বীকৃতি, ভোগ ও চর্চার ক্ষেত্রে যে পার্থক্য করা হয় বা বাঁধা দেওয়া হয় বা বাদ দেওয়া হয় যার ফলে মানুষ দূর্বল বা ক্ষতিগ্রস্থ হয় তাকে বলে বৈষম্য।

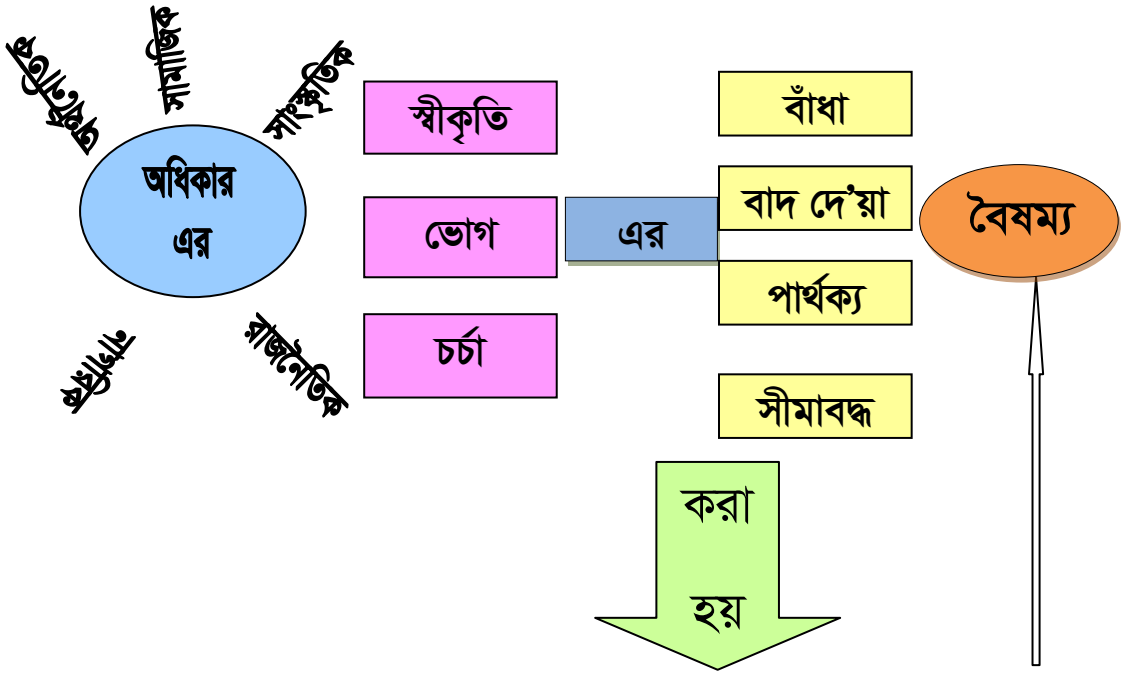

যার ফলে মানুষ দূর্বল বা ক্ষতিগ্রস্থ হয় তাকে বলে বৈষম্য

পাঠ উপকরণ-৪

অধিকার, মানবাধিকার ও নারী পুরুষ সম্পর্ক বিশ্লেষণ

জেন্ডার, মানবাধিকার ও নারীর প্রতি নির্যাতন বিষয়গত দিক দিয়ে ভিন্ন ভিন্ন নামে পরিচিত হলেও একে অপরের সাথে সম্পৃক্ত। সংজ্ঞাগত দিক দিয়ে দেখলে দাড়ায় জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত মানুষের সর্বদা নিয়ে বেঁচে থাকার অধিকার হলো মানবাধিকার, যে অধিকার মানুষ জন্মের সাথে নিয়ে আসে অর্থাৎ সহজাত; যা পৃথিবীর সকল মানুষের জন্য অর্থাৎ সার্বজনীন, যা সে কাউকে দিয়ে দিতে পারে না অর্থাৎ অহস্তান্তরযোগ্য এবং যা খন্ড খন্ড করে ভোগ করা যায় না অর্থাৎ অখন্ডনীয়।

বাংলাদেশ সংবিধান, ১৯৭২ এর তৃতীয় ভাগে 'মৌলিক অধিকার' এর অনুচ্ছেদ ২৭(১) অনুযায়ী সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান এবং আইনের সমান আশ্রয় লাভের অধিকারী এবং ২৮(১) অনুযায়ী কেবল ধর্ম, বর্ণ, নারী পুরুষভেদ বা জন্মস্থানের কারনে কোন নাগরিকের প্রতি রাষ্ট্র বৈষম্য প্রদর্শন করবে না।

পক্ষান্তরে ১৯৪৮ সালের ১০ই ডিসেম্বরে জাতি সংঘের সাধারণ পরিষদ কর্তৃক ঘোষিত মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণা পত্র, (Universal Declaration of Human Rights) ১৯৬৬ সালের ২টি আন্তর্জাতিক দলিল International Covenant on Civil and Political Rights (নাগরিক ও রাজনৈতিক) এবং International Convention on Economic, Social and Cultural Rights (অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক) ও মানুষের মর্যাদা ও অধিকার ভোগের ক্ষেত্রে সমতার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু যখন কোন ব্যক্তি তার মানবাধিকার এর স্বীকৃতি, ভোগ, চর্চার ক্ষেত্রে কমবেশী হওয়া, নিষেধ অপেক্ষা এবং বাদ পড়ার সম্মুখীন হয় যার ফলাফল স্বরূপ দাঁড়ায় বঞ্চিত হওয়া বা দূর্বল হওয়া তাকেই বলে বৈষম্য।

এই বৈষম্যের ফলে মানবাধিকারের সার্বজনীন, সহজাত, অহস্তান্তরযোগ্য ও অখন্ডনীয় বৈশিষ্ট্যে আঘাত লাগে। এই বৈষম্যের বিস্তৃতি পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র, ধর্ম, সংস্কৃতি প্রতিটি অঙ্গনে। এই বৈষম্যের ফলে কেউ ক্রমাগত অবদমনের শিকার হয় যার ফলাফল দাঁড়ায় বঞ্চনা এবং পরিশেষে হয় সে অধিকার সম্পর্কে অসচেতন, অধিকার দাবী করে না, দাবী করলে সহ্য করতে হয় মানসিক ও শারীরিক নির্যাতন, উদাহরণস্বরূপ যদি শুনতে হয়ঃ

- **পায়ের উপর পা দিয়ে সে বা নারী বসে ছয় বছর পর তার সিথির সিঁদুর খসে।**
- **জাতের মেয়ে কালোও ভাল**
- **গোসল করে চুল দেবে ঝাড়া**
  ঘরের পিছে হাজার পুরুষ খাড়া
- **যে নারী রেধে বেড়ে স্বামীর আগে খায় জানিবে স্বামী মরিবে নিশ্চয়**
- **পুরুষ রাগলে বাদশা, নারী রাগলে বেশ্যা**
- **সতী নারীর পতি মরে না**
- **পুরুষের বসায় সভা ভাল, নারী বসলে এলো মেলো**
- **কথায় কথা বাড়ে জলে বাড়ে ধান বাপের বাড়ী থাকলে কন্যা বাড়ে অপমান**
- **ঝুনা খাইলে গুনাহ নাই পুরুষের অন্যায় ধরতে নাই**
- **যার পুরুষ রনে, সম্মান যার গুনে**
- **হাসিলে গন্ডদেশে টোল পড়ে যার বন্ধ্যা রবে সে রমনী দুনিয়া মাঝার**

অর্থাৎ নারীর রং, দাঁড়ানো, বসা, হাসা, খাওয়া, রাগ, থাকা ইত্যাদি যা তার মানবাধিকার সে ক্ষেত্রে স্বীকৃতি, ভোগ ও চর্চার অবস্থা কি দাঁড়াচ্ছে? পক্ষান্তরে একই বিষয়ে পুরুষের কোথাও বলার অবতারনা ও হয় নাই আবার যেখানে বলা হয়েছে সেখানে ইতিবাচক দৃষ্টি ভঙ্গিতে বলা হয়েছে। তাহলে কথা দাড়াচ্ছে নারী ও পুরুষ উভয়ে মানুষ এবং মানবাধিকারের বৈশিষ্ট্য উভয়ের জন্যই প্রযোজ্য কিন্তু বাস্তবতা কি?

এই বৈষম্যের পিছনে অনেক কারণে হয়েছে, তার পরে মূল কারন হল পিতৃতন্ত্র অর্থাৎ যে সমাজ ব্যবস্থায় নারীকে ক্রমাগত অবদমন বা হেয় করা হয়।

পিতৃতন্ত্র (Patriarchy) মানে পুরুষের প্রভুত্ব। যেখানে পুরুষ তার স্বার্থে বিভিন্নভাবে জবরদস্তি, নির্যাতন বা একপেশে আইনকানুনের মাধ্যমে নারীকে নিয়ন্ত্রণ করে বা নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা চালায়। Elizabath Cady Stanton তাঁর রচিত The woman's Bible গ্রন্থে পিতৃতন্ত্রের মূল মতাদর্শ সম্পর্কে বলেছেন, নারী পুরুষের পরে, পুরুষ থেকে এবং পুরুষের জন্য সৃষ্ট পুরুষের অধীন একটি নিকৃষ্ট জীব। (Woman was made after man, of man and for man, an inferior being subject to man) সৃষ্টির আদিতে নারী পুরুষের দৈহিক ভিন্নতা ছাড়া অন্য কোন বৈষম্য ছিল না, ছিল না পিতৃতন্ত্র বা পুরুষতন্ত্র। জমি বা ভূমির কোন মালিকানা বা পরিবার প্রথা ছিল না। সে সময়কার গোষ্ঠিবদ্ধ সমাজে নারী-পুরুষের জৈবিক চাহিদাপূরণে ছিল না কোন বাধা।

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ধাতুর ব্যবহার, গবাদি পশু পালন, কৃষি ব্যবস্থার প্রচলেন গোষ্ঠীবদ্ধ সমাজ ব্যক্তি মলিকানাধীন সমাজে রূপান্তরিত হওয়ার ফলে পুরুষ কর্তা সেজে বসে। সম্পত্তি, সম্পদ এবং সন্তানের ওপর তার একক কর্তৃত্ব জন্মায়। সম্পদের বৈধ উত্তরাধিকার নিশ্চিত করার জন্য নারীর জন্য একজন পুরুষ বা স্বামী ছাড়া অন্য কোন যৌন সম্পর্ক স্থান নিষিদ্ধ করা হয় কঠোরভাবে। নানা ধরনের শোষন-নির্যাতন-নিপীড়নের মাঝে নারীকে বুঝিয়ে দেয়ার চেষ্টা চলে, পুরুষের তুলনায় নারীরা কমবুদ্ধি এবং যোগ্যতাসম্পন্ন, তারা হীন, দুর্বল, পুরুষরাই কেবল অধিকতর স্বাধীনতা, অধিকার এবং ক্ষমতা ভোগ করতে পারে। পিতৃতান্ত্রিক সমাজের নিয়ন্ত্রকরা এসব তত্ত্ব আদিমকাল থেকেই নারীর মস্তিস্কের ভেতর ঢুকিয়ে দিয়েছে নানা কৌশলে।

এই পিতৃতন্ত্র এর বেড়াজাল থেকে বেড় হতে হলে অনুধাবন করতে হবে যখন নারীকে এই লেখায় উলে-খিত সুঃয/ লোকপুরান/প্রবাদ/এবচন দেয়া হয় সেক্ষেত্রে নারীর এক ধরনের বৈশিষ্ট্য দাড়িয়ে যায় আর এই বৈশিষ্ট্য নির্ধারন করে তার কাজ, ভূমিকা ইত্যাদি। এই ভূমিকার ফলে সে পায়না সুযোগ সুবিধায় প্রবেশাধিকার এবং ফলাফল ক্ষমতা তার হাতে থাকে না। এই অবস্থা চলছে, পরিবর্তন ও হচ্ছে কিন্ত চলতে থাকলে পৃথিবীর ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যাবে। এই পিতৃতন্ত্র বিভিন্ন রূপে পুরুষ হয়ে ক্ষমতার সামনে বসে, নারীকে ব্যবহার করে চালায় তার কার্যক্রম তার মধ্যে সবচেয়ে বেশী হচ্ছে নারীর প্রতি পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র কর্তৃক নির্যাতন। কেউ নির্যাতন করে কথা দিয়ে, কেউ করে সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেয়, কেউ করে আইন প্রণয়ন করে সরবার কেউ না করে আইনী প্রতিকার সঠিকভাবে না দিয়ে বা অন্যায়ভাবে ব্যবহার করে।

এই নারীর প্রতি নির্যাতন এর বহি:প্রকাশ বিভিন্নভাবে যেমন দৈহিক নির্যাতন (মারধর, চড় থাপ্পড়, লাথি মারা) মানসিক নির্যাতন (বকা-ঝকা, গালিগালাজ, অপমান, নির্যাতনের হুমকি, চলাফেরার বিধি নিষেধ) যৌন নির্যাতন (জোরপূর্বক বা অনিচ্ছাকৃত যৌনকর্মে বাধ্য করা, যৌন হয়রানী) ইত্যাদি।

নারীর প্রতি বৈষম্য দূর করতে রাষ্ট্র ও নাগরিক উভয়েরই রয়েছে দায়বদ্ধতা রাষ্ট্র তার নাগরিকের কাছে দায়বদ্ধ এইভাবে যে–

- ✓ **রাষ্ট্র নাগরিকের অধিকার খর্ব করবে না**
- ✓ **রাষ্ট্র নাগরিকের অধিকার রক্ষা করবে**
- ✓ **রাষ্ট্র নাগরিকের অধিকার রক্ষার ক্ষেত্রে প্রচারনার কাজ করবে**
- ✓ **রাষ্ট্র নাগরিকের অধিকার রক্ষা ও প্রতিষ্ঠায় কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করবে**

পক্ষান্তরে নাগরিক লক্ষ্য রাখবে রাষ্ট্র নাগরিকের প্রতি দায়িত্ব পালন করছে কিনা এবং নৈতিকভাবে লক্ষ্য রাখবে এবং কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করবে যেমন মানবাধিকার লংঘন প্রতিরোধ, অপরাধ হলে পরে ব্যবস্থা নেয়া, সচেতনতা বৃদ্ধি ও দক্ষতা উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড।

পরিশেষে বলা যায় মানুষের মর্যাদায় আঘাত না হানলে কোন বৈষম্যের প্রশ্ন উঠে না। তাই যে যেত ক্ষেত্রে বৈষম্য সৃষ্টি হয়েছে যে যে ক্ষেত্র চিহ্নিত করা, অনুধাবন করা এবং বৈষম্য নিরসনে ব্যবস্থা নেয়া এবং অন্যকে উদ্বুদ্ধ করার মধ্যে রয়েছে প্রকৃত অর্থে মানবাধিকার চর্চা।

প্রচলিত প্রবাদ

১. জাতের মেয়ে কালো ভাল
নদীর পানি ঘোলাও ভাল
সোনার আংটি বাঁকাও ভাল

২. যে নারী রেঁধে বেড়ে স্বামীর আগে খায়
জানিবে স্বামী মরিবে নিশ্চয়

৩. ঝুনা খাইলে গুণাহ নাই
পুরুষের অন্যায় ধরতে নাই

৪. পুরুষের রাগে বাদশা
নারীর রাগে বেশ্যা

৫. নারী হলো দেবী
সহ্য করে সবই

৬. ভাই বড় ধন রক্তের বাঁধন
যদিও পৃথক হয় নারীর কারণ

৭. গাই গুণে দুধ
বাপ গুণে পুত

৮. মেয়ে পরের বাড়ীর ধন
জানে সর্বজন

৯. নারীর পছন্দ তিন
ঝাল, টক ও কড়া স্বামী

১০. সতী নারীর পতি মরে না

১১. ঘুমিয়ে আছে শিশুর পিতা সকল
শিশুর অন্তরে

১২. ভাত খাইছি, মাছ খাইছি আরো খাইছি খাসি
সঙ্গে করে নিয়ে আসছি খেদমতের দাসী

১৩. পায়ের উপর পা তুলে যে বা নারী বসে
ছয় বছর পর তার সিঁধির সিদুর খসে

১৪. পুরুষের বসায় সভা ভালো
নারীর বসায় এলোমেলো

১৫. তিন নারী একত্রে হলে ফেরেস্ড়া ঘরে থাকেনা

১৬. হাসিলে গন্ডস্থলে টোল পড়ে যার
বন্ধ্যা রবে সে নারী দুনিয়ার মাঝার

১৭. ঝিকে মেরে বৌকে শেখানো

১৮. লেপা পৌছাতে বাড়ী
তেলে সিঁদুরে নারী

১৯. অভাগার গরু মরে
ভাগ্যবানের বউ মরে

২০. ভাই মরে গেলে ভাই পাবো না
বৌ মরলে বৌ পাবো

২১. বাপের বাড়ি এই গায়, শশুর বাড়ী ঐ গায়
তোমার বাড়ী কইগো নারী, তোমার বাড়ি কই

২২. নারী হচ্ছে শয়তানের গাড়ী

২৩. যেমন মা তেমন ঝি,
তেমন তান নাতিপুতি

২৪. বাপ কা বেটা
সিপাইকা ঘোড়া

২৫. কথায় কথা বাড়ে
জলে বাড়ে ধান
বাপের বাড়ি থাকলে কন্যা বাড়ে অপমান

পাঠ উপকরণ-৫

জেন্ডার এন্ড সেক্স

বৃটিশ শাসন অবসানের পরও এই উপমহাদেশের মেয়ে শিশু এবং নারী দ্বিতীয় শ্রেনীর মানুষ হিসেবে বিবেচিত। আমাদের সমাজে অধিকাংশ নারী ক্ষমতাহীন, মর্যাদাহীন ও সম্পদহীন অবস্থায় রয়েছে। পিতৃতান্ত্রিক মূল্যবোধের কারণে নারী প্রতিনিয়ত

নানা নিপীড়ন, নির্যাতন ও সমস্যার শিকার হচ্ছে যা তার অবস্থাকে আরো নাজুক করে তুলেছে। নারীর প্রতি এই অন্যায় আচরণ ও বৈষম্য নারীদের শারীরিক বা মানসিক কারণে সৃষ্ট হয়নি। এর পেছনে রয়েছে সামাজিক-রাজনৈতিক কর্তৃত্ব তথা ক্ষমতার প্রভাব। সভ্যতার উষা লগ্ন থেকে শুরু করে ক্রম বিবর্তনের ধারায় সমাজে নারী পুরুষের মাঝে সামাজিক আচরণ ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। আদিম সমাজে নারী-পুরুষের সম্পর্ক ছিল সমতা ও সহযোগিতার। সামাজিক ভাবে পার্থক্যের ধারণা ছিল না। নারী পুরুষ উভয়ের কাজই ছিল সমান গুরুত্বের, সব কাজই বেঁচে থাকার জন্য অপরিহার্য এই ধারণা ছিল মূখ্য। কিন্তু সভ্যতার ক্রমবিবর্তনে প্রযুক্তি, জ্ঞান ও ক্ষমতার বিকাশে পিতৃতন্ত্রের ধারকেরা অর্থাৎ যারা নারীর ওপর সর্বময় ক্ষমতা চর্চা ও কর্তৃত্ব বজায় রাখতে চায় তারা নারী ও পুরুষের সম্পর্কটাকে নতুন রূপদান করে। ক্রমান্বয়ে নারীদের শ্রমশক্তি, সন্তান উৎপাদন ক্ষমতা,যৌনতা, গতিশীলতা এবং সম্পত্তি ও অন্যান্য অর্থনৈতিক সম্পদের ওপর অধিকারকে নিয়ন্ত্রণ করতে শুরু করে। শুধুমাত্র গৃহস্থালীর কাজে নারীকে সম্পৃক্ত করে তার ভূমিকা পালনের ক্ষেত্রও সীমিত করে ফেলে এবং পিতৃতান্ত্রিক মূল্যবোধ বিকাশ লাভ করে। এই মূল্যবোধ নারী ও পুরুষের মধ্যকার প্রাকৃতিক পার্থক্যকে বৈষম্যে রূপ দেয়। সমাজে নারীদের দমিয়ে রাখার জন্য প্রচলন করে কিছু ধারণা বা বিশ্বাস। নারীদের নিয়ে প্রচলিত এই বিশ্বাস যুগ যুগ ধরে সমাজে চর্চা হয়ে আসছে। নারী পুরুষ উভয়ই এগুলো বিশ্বাস এবং ধারণ করে চলেছে-

সমাজে নারীদের নিয়ে প্রচলিত বিশ্বাস

১) নারীর বুদ্ধি কম
২) সৃষ্টিকর্তা নারীদের পুরুষের অধীন করে পাঠিয়েছে
৩) নারী অসচেতন
৪) নারীর নেতৃত্ব দেবার ক্ষমতা নেই
৫) নারী দুর্বল এবং সঠিকভাবে কোন কাজ করতে অক্ষম
৬) প্রকৃতিগতভাবে নারী লাজুক, গৃহই হচ্ছে তার আসল পরিচয়
৭) নারীর প্রধান কাজ হচ্ছে সন্তান জন্মদান, লালন- পালন,রান্না ও গৃহস্থালীর কাজ করা
৮) নারী খুব আবেগপ্রবণ, তারা দৃঢ়ভাবে কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারে না
৯) নারীরা দায়িত্বশীল নয়
১০) নারী শুধু ভোগের জন্য, শারীরিক সৌন্দর্য্যই তাদের একমাত্র সম্পদ।
১১) নারী তার স্বামীর পরিচয়ে পরিচিত হবেন
১২) নারীদের সবসময় কম খাওয়া উচিত বিশেষ করে গর্ভবতী অবস্থায়
১৩) নারীদের বেশি লেখা পড়ার প্রয়োজন নেই, বেশি শিক্ষিত হলে স্বামীর কথা অমান্য করবে
১৪) পুরুষ ছাড়া নারী অসম্পূর্ন
১৫) নারী লোভী ও ছলনাময়ী
১৬) নারী হিংসুটে, স্বার্থপর ও সন্দেহপ্রবণ
১৭) নারী জটিল ও কঠিন বিষয় বুঝতে অক্ষম
১৮) নারী তরল পদার্থের মতো, যে পাত্রেই ঢালা হয় তারই আকার ধারণ করে

এই সমস্ত হাজারো বিশ্বাস ও দৃষ্টিভঙ্গি নারীদেরকে নিয়ন্ত্রণের জন্য সমাজে প্রচলিত রয়েছে। কালে কালে এইসব বিশ্বাস ও দৃষ্টিভঙ্গি নানারূপ পরিগ্রহ করেছে। সাহিত্যে, গানে, শিল্পে ও কৌতুক, প্রবাদ-প্রবচনে নারীকে দেখানো হয়েছে পুরুষের চেয়ে দুর্বল, অবলা, অক্ষম এবং পুরুষের অধীন হিসেবে। এই ধারণা নারী পুরুষের মধ্যে অসমতা তৈরি করেছে। প্রকৃতি ছেলে ও মেয়ে শিশু সৃষ্টি করে, সমাজ কর্তৃক বৈষম্যের ভিত্তিতে নারী ও পুরুষে পরিণত করে। এইখান থেকেই আসে জেন্ডার ও সেক্সের ধারণা।

সেক্স:

লিঙ্গ বা সেক্স হচ্ছে নারী এবং পুরুষের মধ্যে এক ধরনের বৈশিষ্ট্য যা শারীরিক বা দৈহিক এবং জৈবিক পাথর্ক্যকে বুঝিয়ে থাকে। এটা প্রকৃতিই সৃষ্টি করে থাকে, এর ভিত্তি প্রাকৃতিক। পরিবার, সমাজ, দেশ ভেদে এই বৈশিষ্ট্য সব জায়গাতেই একই

রকম, যা পরিবর্তন করা যায় না। এই দৈহিক বা শারীরিক বৈশিষ্ট্য দিয়েই নারী পুরুষ চেনা যায়। শরীরের এই গঠনের জন্য পৃথিবীর সব জায়গায় ছেলে হচ্ছে ছেলে আর মেয়ে হচ্ছে মেয়ে। এই জৈবিক বা শারীরিক গঠনকে সেক্স বলে।

জেন্ডার:

জেন্ডার হচ্ছে নারী ও পুরুষের উপর আরোপিত এক ধরনের বৈশিষ্ট্য, আচরণ বা ভূমিকা যা সে জন্মের পর পরিবার ও সমাজ থেকে পায়। এই বৈশিষ্ট্যগুলো সমাজ বা মানুষ কর্তৃক সৃষ্ট। নারী ও পুরুষের মধ্যে দৈহিক বা জৈবিক পার্থক্য ছাড়া অন্য যে পার্থক্য বিদ্যমান যেমন, কাপড়, চলন, বলন, শিক্ষা, আচরণ, দায়িত্ব, দৃষ্টিভঙ্গি সবটাই সমাজ তৈরী করেছে যা স্থান, কাল, পাত্র ভেদে ভিন্নতা রয়েছে। এটা অবশ্যই পরিবর্তন করা যায়। নারী ও পুরুষের এই সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিচিতিই হচ্ছে জেন্ডার। যেমন- একজন নারীর জন্য সন্তান জন্মদান বা মা হওয়াই জীবনের শ্রেষ্ঠ লক্ষ্য হিসেবে সমাজ নির্দিষ্ট করে দেয়, কিন্তু একজন পুরুষের বেলায় পিতা হওয়া নয় বরং একজন কর্মঠ ব্যক্তি হওয়াই সমাজের কাছে আকাঙ্খিত। এই দৃষ্টিভঙ্গি একজন নারী বা পুরুষকে মানুষ করে তোলার পরিবর্তে ক্রমশ একজন নারী বা পুরুষ করে তোলে। এভাবেই আমরা পুরুষসুলভ বা নারী সুলভ আচরণ সংজ্ঞায়িত করি।

জেন্ডার ও সেক্স এর পার্থক্য

সেক্স	জেন্ডার
প্রাকৃতিকভাবে তৈরি নারী এবং পুরুষের মাঝে জৈবিক, শারীরিক ভিন্ন বৈশিষ্ট্যকেই বলে সেক্স।	সমাজ কর্তৃক নির্ধারন নারী ও পুরুষের পোষাক, কাজ, আচরণ ইত্যাদির ভিন্নতাই হচ্ছে জেন্ডার।
সেক্স অপরিবর্তনীয় এবং সার্বজনীন। পরিবার, সমাজ, দেশ ভেদে একই রকম।	জেন্ডার পরিবর্তনশীল। সমাজ, দেশ এবং যুগ ভেদে এটি ভিন্ন ভিন্ন রকম হয়।
এটি প্রকৃতির সৃষ্ট বলে একে প্রাকৃতিক লিঙ্গ বলা যায়।	এটি সমাজ কর্তৃক সৃষ্ট বলে একে সামাজিক লিঙ্গ বলা যায়।
পৃথিবীর সব জায়গাতেই এটা একই রকম অর্থাৎ সর্বজনীন	সমাজ সংস্কৃতির ভিন্নতার ফলে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে জেন্ডার ভূমিকার মধ্যেও ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়।

জেন্ডার সম্পর্ক বিশেষণের মুল উপাদান

(Key component of Gender Relation Analysis)

নারী ও পুরুষের জেন্ডার ভূমিকার ভিন্নতার কারণে তাদের উপর উন্নয়নের যে বিভিন্নমূখী প্রভাব পরিলক্ষিত হয় তা পরিমাপের পদ্ধতিগত দৃষ্টিভঙ্গি হচেছ 'জেন্ডার সম্পর্ক বিশ্লেষণ'। জেন্ডার ভূমিকা শ্রমবিভাজনকে প্রভাবিত করে যা কিনা নারী পুরুষের ক্ষমতার অসমতা বৃদ্ধি করে, তাছাড়া সিদ্ধান্ত গ্রহণ, তথ্য প্রাপ্তি, সুবিধা ও সম্পদ অর্জনের ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের প্রবেশাধিকারের অসমতাকেও ত্বরান্বিত করে।

জেন্ডার সম্পর্ক বিশ্লেষণের ৫টি মুল উপাদানঃ

১. জেন্ডার ভূমিকা (Gender role)ঃ

নারী ও পুরুষের মধ্যে সমাজ কর্তৃক নির্দেশিত পার্থক্যসমূহ থেকে জেন্ডার ভূমিকার উৎপত্তি যা নারী ও পুরুষকে শেখায় তার কিভাবে চিন্তা করা উচিত, তার কি কাজ করা উচিত এবং তার অনুভবগুলো কেমন হবে। জেন্ডার ভূমিকা প্রতিনিয়নত পরিবর্তনশীল। সমাজ সংস্কৃতির ভিন্নতার ফলে জেন্ডার ভূমিকার মধ্যেও ভিন্নতা পরিলক্ষিত হতে দেখা যায়। যেমন, ইংরেজী সংস্কৃতিতে জেন্ডার ভূমিকা যেমন বাঙ্গালী সংস্কৃতিতে তা আবার বদলে যেতে পারে।

২. জেন্ডার শ্রম বিভাজন (Gender Divisions of Labor)ঃ

জেন্ডার শ্রম বিভাজন বলতে বুঝায় সমাজ তার সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ায় এবং সমাজের বেধে দেওয়া বিধি নিষেধের দ্বারা নারী ও পুরুষের কাজকে আলাদা করে থাকে। এক্ষেত্রে সমাজ ঠিক করে দেয় নারীর জন্য কোন কাজগুলো গ্রহণযোগ্য এবং পুরুষের জন্য কোন কাজগুলো গ্রহণযোগ্য।

যে কাজের সাথে অর্থ, সম্মান এবং ক্ষমতা জড়িত সেগুলোকে বুঝানো হয়েছে। এ ধরনের ভূমিকা বাজার উৎপাদনকে যেমন

অন্তর্ভূক্ত করে তেমনি গৃহ উৎপাদনকেও বোঝায়।

করতে হয় কিন্তু এর বিনিময়ে কোন অর্থ উপার্জন হয় না এবং দেখা যায় যে, এই কাজগুলো উৎপাদনে সাহায্য করে এইসব কাজকে পুনঃ উৎপাদনমূলক কাজ বলে। যেমন- সন্তান ধারণ, লালন পালন, গৃহস্থালীর কাজ।

সমাজেযে কাজগুলো দ্বারা কোন অর্থ উপার্জিত হয় না কিন্তু সম্মান নিয়ে আসে তাকে সামাজিক ব্যবস্থাপনা মূলক কাজ বলে। যেমন- বিনামূল্যে শিক্ষাদান, সেচ্চছায় রক্তদান, বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠান আয়োজনে সহায়তা করা।

যে সব কর্মকান্ড বিভিন্ন রাজনৈতিক কার্যকলাপ এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করে সেইসব কাজকে বোঝায়। যেমন- সভা সমাবেশে অংশগ্রহণ, নির্বাচনে প্রতিনিধিত্ব করা এবং প্রতিনিধি নির্বাচন করা।

জেন্ডার শ্রমবিভাজন

জেন্ডার শ্রমবিভাজন নারী-পুরুষের দৈনন্দিন কাজ, দায়-দায়িত্ব, ব্যবহৃত সময়ের ক্ষেত্রে ভিন্নতা বা অসমতা নির্দেশ করে। অর্থাৎ সমাজের প্রচলিত সামাজিক সাংস্কৃতিক রীতিনীতি, ঐতিহ্য ও ব্যবস্থার ফল হিসেবে একজন নারী ও একজন পুরুষ যে ভিন্ন ভিন্ন কাজ ও দায়-দায়িত্ব পালন করে- যা সামাজিকভাবে গড়ে উঠেছে তাকেই জেন্ডার শ্রমবিভাজন বলা হয়। এই জেন্ডার শ্রমবিভাজন অনুযায়ী নারীর সঙ্গে গৃহক্ষেত্র বা বাইরের জগতকে যুক্ত করা হয়। অর্থাৎ সমাজের বিভিন্ন ধরনের কাজকে 'নারীর কাজ' বা 'পুরুষের কাজ'-এভাবে আলাদা করে চিহ্নিত করা হয়। জেন্ডার ভূমিকায় দেখা যায় যে সমাজে নারী ও পুরুষ উৎপাদনমূলক, পুনঃউৎপাদনমূলক সামাজিক ব্যবস্থাপনা ও রাজনৈতিক ব্যবস্থাপনা এ ৪ ধরনের কাজ করে থাকে। ব্যাপকভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় এই নানান প্রকৃতির কাজে জড়িত থাকার বিষয়টি সমাজ কর্তৃক আরোপিত। সুতরাং উক্ত শ্রম বিভাজনের মাধ্যমে নারী পুরুষের যে ভূমিকা তা সমাজে বৈষম্যের আকারে প্রতিফলিত হয়।

পুনঃ উৎপাদনমূলক ভূমিকা

যে কাজগুলো বারবার করতে হয় কিন্তু এর বিনিময়ে কোন অর্থ উপার্জন হয় না এবং দেখা যায় যে এই কাজগুলো উৎপাদনে সাহায্য করে এসব কাজকে পুনঃউৎপাদনমূলক কাজ বলে। যেমন- সন্তান ধারণ, লালন পালন, গৃহস্থালীর কাজ। তবে এর দ্বারা শুধু জৈবিক পুনঃ উৎপাদনকে বুঝায় না বরং শ্রম শক্তির এবং সামাজিক সম্পর্কের পুনঃউৎপাদনকে বুঝায়। সে হিসাব থেকে পুনঃ উৎপাদনমূলক কাজকে ২ ভাগে ভাগ করা যায়-

১। জৈবিক পুনঃ উৎপাদনমূলক

২। সামাজিক পুনঃ উৎপাদনমূলক

উৎপাদনমূলক ভূমিকা

উৎপাদনমূলক ভূমিকা বলতে বুঝায়, নারী/পুরুষ নির্বিবাদে নগদ কিছুর বিনিময়ে যে কাজ করে। এ ধরনের ভূমিকা বাজার উৎপাদনকে যেমন অন্তর্ভূক্ত করে তেমনি গৃহ উৎপাদনকেও বুঝায়। বাজার উৎপাদনের ক্ষেত্রে কাজটির বিনিময় মূল্য থাকবে আর গৃহ বা মৌলিক উৎপাদনের ক্ষেত্রে কাজটির ব্যবহার মূল্য থাকবে, তবে পরোক্ষভাবে তার বিনিময় মূল্য অবশ্যই থাকবে। উদাহরণস্বরূপ- একজন পুরুষ কৃষক হিসেবে কাজ করে, অথবা মাঠ থেকে ফসল সংগ্রহের পর তা বাজারজাতকরণ বা ঘরে মজুদ রাখার আগ পর্যন্ত কোন নারী ফসল প্রক্রিয়াজাতকরণের যে সমস্ত কাজ করে থাকে তা উৎপাদনমূলক ভূমিকা হিসেবে অন্তর্ভূক্ত করা যায়।

সামাজিক ব্যবস্থাপনা

সমাজে যে কাজগুলো দ্বারা কোন অর্থ উপার্জিত হয় না কিন্তু সম্মান নিয়ে আসে তাকে সামাজিক ব্যবস্থাপনামূলক কাজ বলে। যেমন- বিনামূল্যে শিক্ষাদান, স্বেচ্ছায় রক্তদান, বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠান আয়োজনে সহায়তা করা। নারী পুরুষের সাম্য বিশ্লেষণের আলোকে দেখা যায় যে, এ ধরনের কাজে সাধারণত পুরুষদেরই নিযুক্ত হতে দেখা যায়। যা সামাজিক স্বীকৃতি ও মর্যাদা লাভের ক্ষেত্রে নারীদেরকে পুরুষদের তুলনায় পিছিয়ে রাখছে।

রাজনৈতিক ব্যবস্থাপনা

নেতৃত্ব প্রদানমূলক কার্যকলাপ অর্থাৎ যে সব কর্মকান্ড বিভিন্ন রাজনৈতিক কার্যকলাপ এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করে সেসব কাজকে রাজনৈতিক ব্যবস্থাপনামূলক কাজ বলে। যেমন- সভা সমাবেশে অংশগ্রহণ, নির্বাচনে প্রতিনিধিত্ব করা এবং প্রতিনিধি নির্বাচন করা। বর্তমান অবস্থা বিবেচনা করলে দেখা যায় যে বেশীর ভাগ পুরুষরাই রাজনৈতিক ব্যবস্থাপনামূলক ভূমিকার সাথে জড়িত নারীরা এক্ষেত্রে পুরুষদের চাইতে অনেক পিছিয়ে আছে। তবে নারীরাও ধীরে ধীরে এর সাথে যুক্ত হচ্ছে।

জেন্ডার শ্রমবিভাজন সমাজে নারী-পুরুষের মধ্যে দায়িত্ব, ভূমিকা ও কাজের প্রচলিত নির্দেশের পাশাপাশি এদের মধ্যে গুণগত এবং পার্থক্যসূচক বৈশিষ্ট্য আরোপ করে। যেমন পুরুষের কাজকে অধিক উপার্জনমূলক, গুরুত্বপূর্ণ ও মূল্যবান মনে করে। নারীর কাজকে মনে করে গুরুত্বহীন, মূল্যহীন ও অমর্যাদাকর। সুতরাং জেন্ডার শ্রবিভাজন নারীর অধস্তনতার অন্যতম কারণগুলোর মধ্যে একটি। জেন্ডার শ্রমবিভাজন প্রাকৃতিক কোনো বিষয় নয় কিংবা তা নারী-পুরুষের শারীরিক বৈশিষ্ট্য বা ভিন্নতার কারণে সৃষ্টি হয়নি। বরং তা সামাজিকভাবে ক্রমান্বয়ে গড়ে উঠেছে। এই বৈশিষ্ট্য তাই পরিবর্তনশীল। বিভিন্ন দেশ ও সংস্কৃতিভেদে তার ভিন্নতা রয়েছে। মূলত: নারী-পুরুষের শারীরিক ভিন্নতাকে কেন্দ্র করেই এই জেন্ডার শ্রমবিভাজন ঘটেছে। এই বিভাজনের ধারণা ক্রমান্বয়ে সমাজে একটি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করেছে। উল্লেখ্য, সকল সমাজেই অস্তিত্বের স্বাভাবিক প্রয়োজনে কিছুটা মাত্রায় লিঙ্গভিত্তিক শ্রমবিভাজন বিদ্যমান রয়েছে। এটা প্রাকৃতিক, কিন্তু এর ভিত্তিতে জেন্ডার শ্রমবিভাজনের মাধ্যমে সমাজে নারীর ভূমিকাকে অবমূল্যায়ন করা হয়। পুরুষের কাজকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করা হয়। এই ধারণা কোনো মানদণ্ডেই যৌক্তিক নয়। সমাজে নারী-পুরুষের সমতা তৈরির ক্ষেত্রে জেন্ডার শ্রমবিভাজন বড় অন্তরায় হিসেবে কাজ করে।

৩। প্রবেশগম্যতা (Access)ঃ

প্রবেশাধিকার অর্থ কোনো কিছু পাওয়া বা কোনো কিছুর সহজলভ্যতা। প্রবেশাধিকার সব সময় গ্রহণীয় জেন্ডার ভূমিকা ও প্রতিষ্ঠিত জেন্ডার শ্রমবিভাজন দ্বারা প্রভাবিত। জেন্ডার সম্পর্ক বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে যেসব জায়গায় প্রবেশাধিকার থাকার কথা বলা হয় তা হচ্ছে

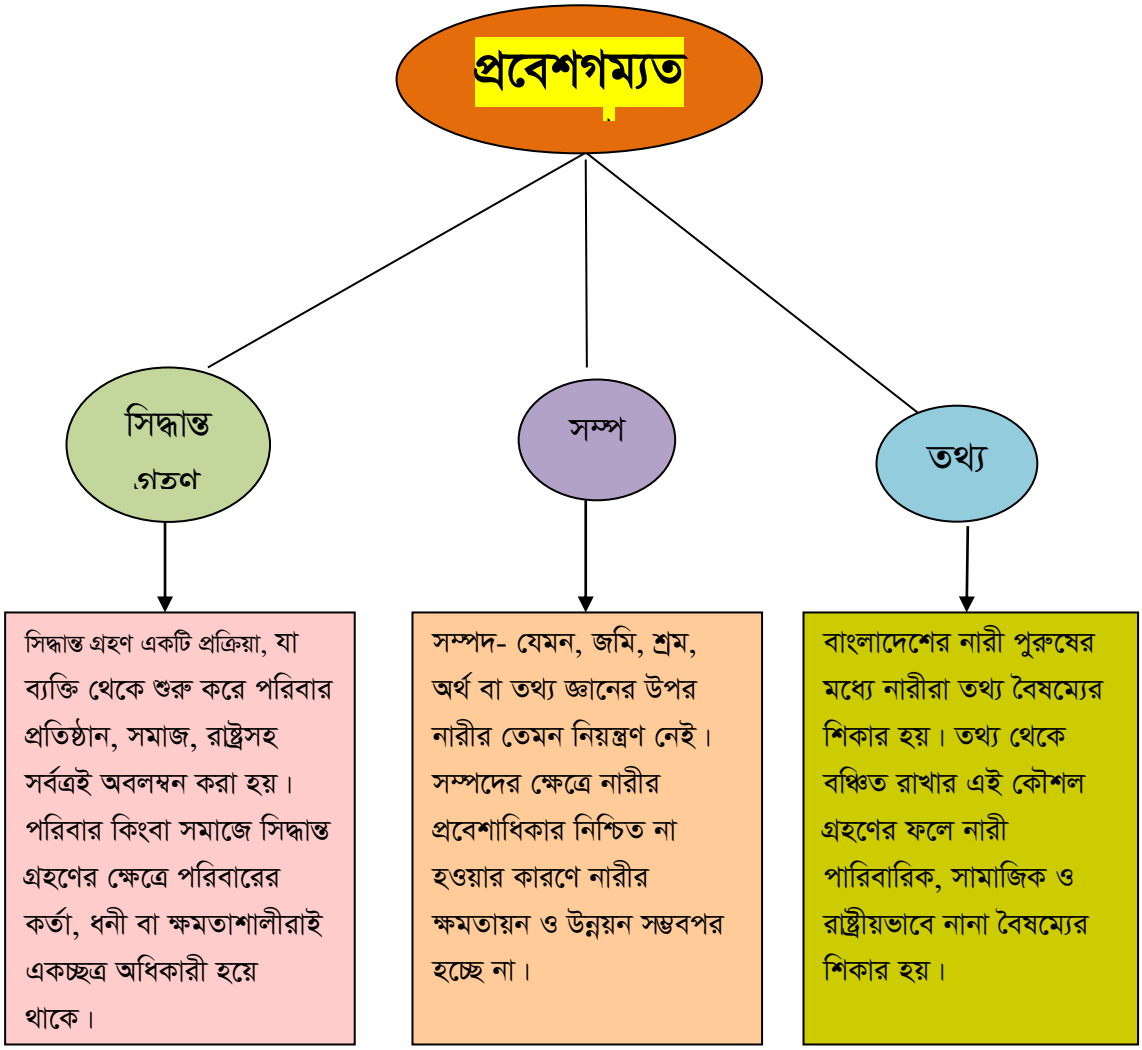
প্রবেশগম্যত
সিদ্ধান্ত গ্রহণ
সম্প
তথ্য
সিদ্ধান্ত গ্রহণ একটি প্রক্রিয়া, যা ব্যক্তি থেকে শুরু করে পরিবার প্রতিষ্ঠান, সমাজ, রাষ্ট্রসহ সর্বত্রই অবলম্বন করা হয়। পরিবার কিংবা সমাজে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে পরিবারের কর্তা, ধনী বা ক্ষমতাশালীরাই একচ্ছত্র অধিকারী হয়ে থাকে।
সম্পদ- যেমন, জমি, শ্রম, অর্থ বা তথ্য জ্ঞানের উপর নারীর তেমন নিয়ন্ত্রণ নেই। সম্পদের ক্ষেত্রে নারীর প্রবেশাধিকার নিশ্চিত না হওয়ার কারণে নারীর ক্ষমতায়ন ও উন্নয়ন সম্ভবপর হচ্ছে না।
বাংলাদেশের নারী পুরুষের মধ্যে নারীরা তথ্য বৈষম্যের শিকার হয়। তথ্য থেকে বঞ্চিত রাখার এই কৌশল গ্রহণের ফলে নারী পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয়ভাবে নানা বৈষম্যের শিকার হয়।

৪. ক্ষমতা সম্পর্ক (Power Relation):

ক্ষমতা সম্পর্ক বলতে কোনো কিছু করা এবং ফল লাভের জন্য ব্যক্তি বা শ্রেণীর সক্ষমতাকে বুঝায় যা জেন্ডার সমতা নিশ্চিত করার জন্য বর্তমান রাজনৈতিক, সামাজিক, ও অর্থনৈতিক পদ্ধতি এবং নিয়মনীতির পরিবর্তন ঘটায়।

ক্ষমতার স্তর নিম্নরূপ:

নিম্ন ক্ষমতা **মধ্য ক্ষমতাউচ্চ ক্ষমতা**

চাকুরীতে প্রবেশের ফলে সরাসরি সুবিধালাভ	সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় ব্যক্তিগত প্রবেশাধিকার	কোন কাজ করার উদ্যেগ গ্রহণ করার সক্ষমতা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহন করার সক্ষমতা যা বর্তমান সামাজিক, অর্থনৈতিক পদ্ধতি ও এর মূল্যবোধ কে প্রভাবিত করে।

৫. জেন্ডার চাহিদা (Gender Needs)ঃ

উপরিউক্ত চারটি বিষয় থেকেই জেন্ডার চাহিদা উদ্ভুত। কারণ নারী পুরুষের ভিন্ন ভিন্ন জেন্ডার ভূমিকা রয়েছে। তাদের কাজের ভিন্নতা আছে, সম্পদ এবং কর্মক্ষেত্রে তাদের প্রবেশাধিকারের সুযোগের ক্ষেত্রে কম-বেশী আছে এবং তাদের সম্পর্কও অসম। সর্বোপরি তাদের চাহিদাও ভিন্ন ভিন্ন।

জেন্ডার চাহিদা নিরুপনে সাধারণতঃ দু ধরণের জেন্ডার চাহিদাকে বুঝানো হয়।
(ক) বাস্তব জেন্ডার চাহিদা (Practical Gender Needs)
(খ) কৌশলগত জেন্ডার চাহিদা (Strategical Gender Needs)

পাঠ উপকরণ-৬

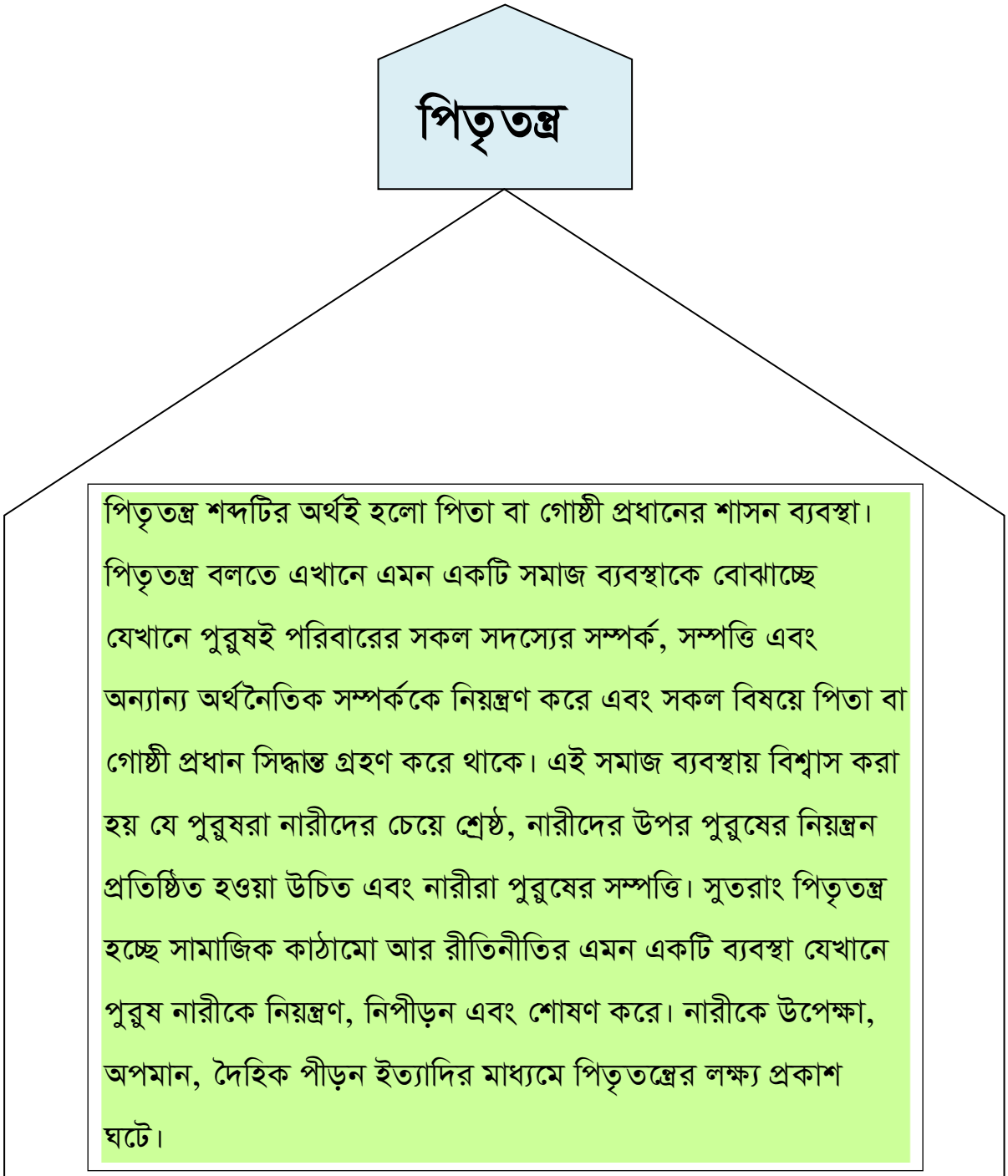

পিতৃতন্ত্র শব্দটির অর্থই হলো পিতা বা গোষ্ঠী প্রধানের শাসন ব্যবস্থা। পিতৃতন্ত্র বলতে এখানে এমন একটি সমাজ ব্যবস্থাকে বোঝাচ্ছে যেখানে পুরুষই পরিবারের সকল সদস্যের সম্পর্ক, সম্পত্তি এবং অন্যান্য অর্থনৈতিক সম্পর্ককে নিয়ন্ত্রণ করে এবং সকল বিষয়ে পিতা বা গোষ্ঠী প্রধান সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকে। এই সমাজ ব্যবস্থায় বিশ্বাস করা হয় যে পুরুষরা নারীদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ, নারীদের উপর পুরুষের নিয়ন্ত্রন প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত এবং নারীরা পুরুষের সম্পত্তি। সুতরাং পিতৃতন্ত্র হচ্ছে সামাজিক কাঠামো আর রীতিনীতির এমন একটি ব্যবস্থা যেখানে পুরুষ নারীকে নিয়ন্ত্রণ, নিপীড়ন এবং শোষণ করে। নারীকে উপেক্ষা, অপমান, দৈহিক পীড়ন ইত্যাদির মাধ্যমে পিতৃতন্ত্রের লক্ষ্য প্রকাশ ঘটে।

পিতৃতন্ত্র ও এর উৎস

পিতৃতন্ত্র শব্দটির অর্থই হলো পিতা বা গোষ্ঠী প্রধানের শাসন ব্যবস্থা। পিতৃতন্ত্র বলতে এখানে এমন একটি সমাজব্যবস্থাকে বোঝাচ্ছে যেখানে পুরুষই পরিবারের সকল সদস্যের সম্পর্ক, সম্পত্তি এবং অন্যান্য অর্থনৈতিক সম্পর্ককে নিয়ন্ত্রণ করে এবং সকল বিষয়ে পিতা বা গোষ্ঠী প্রধান সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকে। এই সমাজ ব্যবস্থায় বিশ্বাস করা হয় যে পুরুষগণ নারীদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ, নারীদের উপর পরুষের নিয়ন্ত্রন প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত এবং নারীরা পুরুষের সম্পত্তি। সুতরাং পিতৃতন্ত্র হচ্ছে সামাজিক কাঠামো আর রীতিনীতির এমন একটি ব্যবস্থা যেখানে পুরুষ নারীকে নিয়ন্ত্রণ, নিপীড়ন এবং শোষণ করে। নারীকে উপেক্ষা, অপমান, দৈহিক পীড়ন ইত্যাদির মাধ্যমে পিতৃতন্ত্রের লক্ষ্য প্রকাশ ঘটে। মূলতঃ পিতৃতন্ত্রের মূলে কাজ করে বৈষম্য। আর এই বৈষম্য ক্রমাগতভাবে নারীকে সর্বক্ষেত্রে হেয় করে।

সিলভিয়া ওয়াল বি বলেছেন পিতৃতন্ত্র ‘সামাজিক কাঠামো আর রীতিনীতির এমন একটি ব্যবস্থা যেখানে পুরুষ নারীকে নিয়ন্ত্রণ, নিপীড়ন এবং শোষন করে’।

তাই বলা যায়, পিতৃতন্ত্র এমন একটি ব্যবস্থা যার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত থাকে এমন একটি মতাদর্শ যা পুরুষকে নারীর তুলনায় বেশী দক্ষ এবং শক্তিশালী বলে মনে করে, নারীর উপর পুরুষের আধিপত্যকে অনুমোদন করে এবং নারীকে পুরুষের সম্পত্তি বলে গণ্য করে।

সাধারণভাবে পিতৃতান্ত্রিক চিন্তাভাবনায় পুরুষের কর্তৃত্ব প্রচলিত থাকলেও, নারীরা অনেক সময় এই ভাবনাগুলোর ধারক-বাহক। যেমন- কোন কোন সময় নারীরা ক্ষমতার অধিকারী হয়ে কিছু সুবিধা আদায়

করে নিয়েছে এবং দুর্বলদের অধঃস্তন করে রেখেছে পিতৃতান্ত্রিক মনোভাবের বশবর্তী হয়ে। তাই পিতৃতন্ত্রকে একটি "সামাজিক ব্যবস্থা" হিসাবে দেখাটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আর এভাবে দেখলে পিতৃতন্ত্র **পুরুষদের বিপক্ষে বা পুরুষ মাত্রই আধিপত্যবাদী আর নারী মাত্রই বশ্যতার অধীন** এই ধারণাকে মিথ্যা প্রমাণ করা যায়।

এই পিতৃতান্ত্রিক মনোভাবে সবচেয়ে শক্ত ঘাঁটি হিসাবে পরিবারকে সনাক্ত করা যেতে পারে। এই পরিবারেই একটি শিশু বেড়ে ওঠার সাথে সাথে পিতৃতান্ত্রিক আদর্শকে ধারণ করে। ছেলেরা নিজেদের মূল্যবান ভাবতে শেখে আর হয়ে ওঠে কঠোর, আত্মবিশ্বাসী, উপার্জনকারী, নির্যাতনকারী, সিদ্ধান্ত প্রদানকারী। আর প্রচলিত সামাজিক ধারণা অনুযায়ী মেয়েরা হয়ে ওঠে কোমল, শান্ত, ধীরস্থিত, লাজুক, গৃহস্থালী কাজে পারদর্শী, পরনির্ভলশীল। এই ভাবে সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ায় নারী-পুরুষ সম্পর্ক হয়ে যায় বৈষম্যমূলক এবং একই সাথে অসম। আর এই অসম সম্পর্ক সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, আইনগত প্রেক্ষাপটে স্পষ্ট যা পুনঃ পুনঃ চর্চায় হয়ে ওঠে স্বাভাবিক। আসলে পিতৃতন্ত্র এমন একটি Mindsetতৈরী করে যা নারী-পুরুষের অসম সম্পর্ককে/অস্বাভাবিক জিনিষকে স্বাভাবিক মনে করতে শেখায়।

পুরুষতন্ত্রের নিয়ন্ত্রণ এলাকা:

পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সাধারণতঃ পুরুষ নারী জীবনের নিম্নলিখিত এলাকাগুলি/ক্ষেত্রগুলি নিয়ন্ত্রণ করেঃ

১। মেয়েদের উৎপাদনমূলক ক্ষমতা বা শ্রমশক্তি

বাড়ীতে মহিলারা আজীবন বিনা পারিশ্রমিকে স্বামী, সন্তানদের ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের নানাভাবে সেবাদান করে যান। মহিলারা তার এই শ্রমের কোনো মূল্য দূরে থাক, কোন স্বীকৃতিই পান না। ঘরের বাইরের কাজের ক্ষেত্রে নারী কখনও স্বাধীনতা ভোগ করে না। হয় তাকে শ্রম বিক্রি করতে বাধ্য করা হয় নয়তো তাকে কাজ করার অনুমতিই দেওয়া হয় না। নারীর শ্রম থেকে যে আয় হয় তা হয়ে যায় পুরুষের সম্পত্তি আবার কোথাও কোথাও নারীদের শুধুমাত্র কম মুল্যের বা নিম্নমানের কাজে নিযুক্ত হতে বলা হয়। নারীর শ্রমের উপর এই নিয়ন্ত্রণের মূলে রয়েছে পুরুষের বৈষয়িক লাভ।

২। নারীর সন্তান উৎপাদনঃ

পুরুষ নারীর জন্মদান ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করে। অনেক সমাজেই নারী ক'টি সন্তান নেবে, কখন সন্তান নেবে, জন্ম নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি অবলম্বন করা হবে কিনা ইত্যাদি বিষয়ে নারীর সিদ্ধান্ত গ্রহণের কোনো অধিকারই থাকে না, সব সিদ্ধান্ত পুরুষেই নেয়।

৩। নারীর যৌনতার উপর নিয়ন্ত্রণঃ

নারীকে পুরুষের ইচ্ছা ও চাহিদা অনুযায়ী যৌন তৃপ্তি দিতে বাধ্য করা হয়। বিবাহ বর্হিভূত কোনো সম্পর্ককে নারীর যৌনতার অন্য কোন প্রকাশকে প্রত্যেক সমাজই নৈতিক ও বৈধতার কারণে কঠোর চোখে দেখে। অথচ সমাজ পুরুষের ব্যভিচারের প্রতি অন্ধ থেকে যায়। শুধু তাই নয় কখনও কখনও নারীর যৌনতাকে পুরুষ বিক্রি করে লাভবান হয়। তাকে বেশ্যাবৃত্তিতে ঠেলে দেয়।

৪। নারীর গতিশীলতাঃ

নারীর যৌনতা, সৃষ্টিশীলতা, কর্মক্ষমতা ও সন্তান জন্মদান ক্ষমতার উপর পুরুষের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনে পুরুষ নারীর উপর নানা নিষেধাজ্ঞা ও কড়াকড়ি আরোপ করে। যেমন, পর্দা, ঘরের বাইরে

যাওয়ার বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা পুরুষের সাথে সম্পর্ক ও সংযোগ স্থাপনে বাধা সৃষ্টি করা ইত্যাদি। এভাবে নারীর স্বাধীনতা ও গতিশীলতা খর্ব করা হয়। পুরুষ এক্ষেত্রে একেবারেই স্বাধীন। তার উপর এই নিয়ন্ত্রণের কোনো একটিও আরোপ করা হয় না।

৫।সম্পত্তি ও অন্যান্য অর্থনৈতিক সম্পদঃ

বেশীরভাগ সম্পত্তি ও অন্যান্য উৎপাদনশীল সম্পদ পুরুষের আয়ত্বে থাকে এবং উত্তরাধিকার সূত্রে এক পুরুষের হাত থেকে অন্য পুরুষের হাতে সাধারণত পিতা থেকে পুত্রের হাতে তার মালিকানা বর্তায়। যদিও নারীর উত্তরাধিকার সূত্রে কিছু (পুরুষের তুলনায় অল্প) পাওয়ার থাকে, তবুও তা নানাভাবে আবেগ, সামাজিক চাপ, কখনও বা জোর করে তাকে সেই সম্পত্তির ভোগ থেকে বঞ্চিত করা হয়।

পিতৃতান্ত্রিকতার বেড়াজাল এবং নারী-পুরুষ সম্পর্ক

সাম্প্রতিককালে জেন্ডার সমতা অর্জন অন্যতম উন্নয়ন এজেন্ডা হয়ে উঠেছে। জেন্ডার বৈষম্যের অর্থাৎ পিতৃতান্ত্রিকতার মাশুল শুধু নারীকেই দিতে হয় না, পুরুষ এবং সাধারণভাবে সমাজকেও এর জন্য মূল্য দিতে হয়।

আমাদের পিতৃতান্ত্রিক সমাজে ছেলে সন্তানের প্রতি পক্ষপাত ও মেয়ে সন্তানের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ করতে দেখা যায়। সম্ভবত পর্যাপ্ত খাবার ও যত্নের অভাবে এদেশে ৫ বছরের কম বয়সের মেয়ে শিশুর মৃত্যু হার একই বয়সের ছেলে শিশুর চাইতে ৩৫% থেকে ৫০% বেশী। ছেলে সন্তানের জন্ম দিলে পরিবারে নারীর কদর বহুগুণে বেড়ে যায়। অপরদিকে সন্তানহারা নারী এবং মেয়ে সন্তানের মাকে পরিবার ও সমাজের বিভিন্ন মানুষের কটু কথা, অবহেলা ও অবজ্ঞাসহ বিভিন্নভাবে মানসিক ও শারীরিক নির্যাতন সহ্য করতে হয়। এমনকি এসব কারণে তালাক ও হয়ে থাকে।

পিতৃতান্ত্রিক সমাজে নারীর নিজ শরীরও পুরুষের সম্পত্তি বলে বিবেচিত হয়। সামাজিক মূল্যবোধ অনুযায়ী একজন পুরুষ বা স্বামী যখনই চাইবে তখনই তার ইচ্ছার কাছে স্ত্রীকে সমর্পণ করতে হবে। বিবাহিত নারী কোন্ সময়ে সন্তান গ্রহণ করবে, সন্তান নেবে সব ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয় পরিবারের পুরুষ। এছাড়া পিতৃতন্ত্র সব সময় এটা বলতে চায় যে ধর্মীয়ভাবেই নারীকে পুরুষের অধীন করে দেয়া হয়েছে যা আদৌ সত্য নয়। এমনকি ধর্মীয় আইনে নারীকে যেসব অধিকার দেয়া হয়েছে সেগুলোর অধিকাংশই এই পুরুষ প্রধান তথা পিতৃতান্ত্রিক সমাজে প্রয়োগ করা যায় না। যেমন অনেক শিক্ষিত ও স্বচ্ছল পরিবারে এমন উদাহরণ রয়েছে যেখানে ভাই বা অন্য আত্মীয় স্বজনদের স্বার্থপরতার শিকার হয়ে উত্তরাধিকারীর ন্যায্য পাওনা থেকে নারীরা বঞ্চিত হয়েছে। সম্পত্তির ন্যায্য পাওনা বুঝে নিতে চাইলেই নারীকে আখ্যায়িত করা হয় সম্পত্তি লোভী হিসাবে।

এছাড়া ছেলেদের তুলনায় মেয়েদের স্কুলে কম যাবার পার্থক্যটি নারী শিক্ষার প্রতি অভিভাবকদের নেতিবাচক মনোভাবকে তুলে ধরে। কারণ তারা মেয়েদের শিক্ষার বিষয়টিকে কম মূল্য দেয়। নারী তার অধিকাংশ কাজেরই কোন আর্থিক মূল্য পায় না। সম্পদ বরাদ্দের ক্ষেত্রেও নারীকে ক্রমাগতভাবে উপেক্ষা করা হয়। উন্নয়নশীল দেশগুলিতে কৃষিকাজ এবং সংসারের কাজকে মজুরি শ্রম হিসাবে বিবেচনা করলে দেখা যাবে নারীর কাজের সময় পুরুষের চেয়ে ৩০ শতাংশ বেশী। কিন্তু নারীরা কদাচিৎ জমির মালিক হতে পারে। এছাড়া ঋণ এবং কৃষি সম্প্রসারণ সংক্রান্ত যাবতীয় সুযোগ সুবিধা আসে জমির মালিকদের নামে।

জেন্ডার বৈষম্য নারীর আত্মমর্যাদা ও সম্মান-সমতা ও কর্ম উদ্দীপনাকে নষ্ট করে দেয়। যেসব অভিজ্ঞতা নারীর যোগ্যতা গড়ে তোলে, তাকে দিকনির্দেশনা পেতে সাহায্য করে এবং পুরুষের সমান অংশীদার হতে সক্ষম করে তোলে তা থেকে বঞ্চিত হয় নারীরা এই জেন্ডার বৈষম্যর কারণে।

আমরা অনেকেই পুরুষের সহিংসতার শিকারদের নিয়ে কথা বলে থাকি কিন্তু যারা নির্যাতন করে তাদের অর্থাৎ পুরুষদের নিয়ে কথা বলি না। পুরুষ কেন এত বেশী নিষ্ঠুর হয় ? কেন এবং কিভাবে কিছু পুরুষ এত নিষ্ঠুর এবং অমানবিক হয়ে ওঠে যে সে একটি ছোট্ট মেয়েকে ধর্ষণ করতে পারে? এ ব্যাপারে আমরা কি কখনও একটু ভেবে দেখেছি? ছেলেরা তেজী বা নিষ্ঠুর হয়ে জন্ম নেয় না। আমরা ভদ্র সহানুভূতিশীল অনেক পুরুষের কথা জানি। আবার কিছু রাগী, কর্তৃত্বপরায়ণ পুরুষের চেহারাও আমাদের দেখা আছে যারা তাদের চাইতে উর্ধ্বতনের সামনে সব সময় কুণ্ঠিত হয়ে থাকে। অর্থাৎ সব পুরুষ জন্মগত ভাবে আগ্রাসী, কর্তৃত্বপরায়ণ বা রাগী নয়। এই সমাজ এবং সমাজের মানুষ অর্থাৎ আমরা সবাই মিলেই একজন পুরুষের পুরুষ হয়ে ওঠা নির্ধারণ করি এবং ছেলে বা পুরুষদেরকে ঐ নির্দিষ্ট ছাঁচে ফেলে দিই এবং ঐ নির্দিষ্ট ছাঁচে গড়ে উঠতে বাধ্য করি। ছেলেদেরকে দেখানো হয় দৃঢ়পত্যয়ী হতে। তাদেরকে এভাবে বোঝানো হয় তারা “সংসারের প্রদীপ” এবং তারা মেয়েদের চাইতে শ্রেষ্ঠ। এর ফলে প্রায়ই দেখা যায় বেশীর ভাগ ছেলেরা আগ্রাসী, উচ্চ কণ্ঠ হয়ে ওঠে। আবার বাবা-মাও তাদের প্রশ্রয় দেয়। জেন্ডারের এই গতানুগতিক ধারণা মেয়েদের পাশাপাশি পুরুষদের গতিবিধি, পছন্দ-অপছন্দকে সীমাবদ্ধ করে দিচ্ছে। ছেলেদের শক্তির মুখোশ পরে থাকতে বাধ্য করা হয়। যেহেতু ভাবা হয় যে পুরুষের কান্না, দুর্বলতা, আবেগ- অনুভূতি প্রকাশ করা অনুচিত, তাই তারা নিজেদের দুর্বলতা, অসহায়ত্ব, আবেগ অনুভূতি প্রকাশ করতে পারেনা। এটা প্রায়ই অস্বীকার করা হয় যে, একজন পুরুষও অন্য একজন পুরুষের উপর প্রাধান্য বিস্তার করে । যেসব ছেলেরা নম্র, ভদ্র তারা সব সময় চাপের মুখে থাকে। সাধারণত আশা করা হয় যে পুরুষরা তাদের স্ত্রীদের নিয়ন্ত্রণ করবে। যদি কোন পুরুষ বা স্বামী তার স্ত্রীর সঙ্গে ভাল ব্যবহার করে, সেক্ষেত্রে তাকে “বউ পাগলা” বলে উপহাস করা হয়। যেসব পুরুষ আগ্রাসী বা বল প্রয়োগকারী নয় তাদেরকে ‘হাতে চুরি পরতে’ বলা হয় এবং নারীদের সঙ্গে তুলনা করে অপমান করা হয়। অন্যদিকে যেসব নারী কর্তৃত্বপূর্ণ বা ক্ষমতাবান অবস্থানে থাকে তাদেরকে প্রশংসা করে বলা হয় “এরা পুরুষের মতই ভালো” কিংবা “পুরুষের চেয়ে কম নয়”।

এভাবেই পরিবার, স্কুল, গণমাধ্যম, আইন, রাজনীতি নারী ও পুরুষের জন্য ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশ, মনোভাব, আচার আচরণ, ভূমিকা, অধিকার এমনকি নারী পুরুষের আলাদা আলাদা আশা ও স্বপ্ন নির্মান করে।

পিতৃতান্ত্রিকতাকে চ্যালেঞ্জ করার আন্দোলনে পুরুষদেরও অংশ নিতে হবে। কেননা পিতৃতন্ত্র শুধু নারীদেরই ক্ষতি করছে না। সেই সঙ্গে পুরুষদেরও ক্ষতির কারণ হয়ে দাড়াচ্ছে। তাদের কঠোর অমানবিক করে

তুলছে। তাই জেন্ডার সম্পর্ককে আরও সমতাপূর্ণ ও ন্যায্য করে তুলতে এই পিতৃতান্ত্রিক মনোভাবের পরিবর্তন আনতেই হবে।

পাঠ উপকরণ-৭

সমতা ও সাম্য

সম্পদ বন্টনের একটি প্রক্রিয়া হলো **সাম্য**, যে প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে বিভিন্ন গোষ্ঠীর বিভিন্ন চাহিদার ভিত্তিতে তাদের সুযোগ সুবিধাকে বিবেচনা করা হয়। এর অর্থ হলো এই যে,পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীকে অধিক সুযোগ সুবিধা বা সম্পদ আহরনের পথ প্রশস্ত করতে হবে যাতে করে তাদের উন্নয়ন ত্বরান্বিত হয় এবং প্রত্যেক ক্ষেত্রে/সর্বস্তরে তারা সমান অধিকার ভোগ করতে পারে। সমতার আকাঙ্খা পূরণের জন্য এই সাম্যভিত্তিক বিতরণ প্রক্রিয়া নারী এবং সুবিধা বঞ্চিত গোষ্ঠীর জন্য অত্যাবশ্যক। সাম্য সমতার পথ অজর্নকে প্রশস্ত করে।

সমতা হচ্ছে একটি লক্ষ্য বা মানদন্ড এবং সাম্য হচ্ছে সেই লক্ষ্য অর্জনের একটি প্রক্রিয়া।

সমতার নীতি CEDAW Convention এর কেন্দ্রবিন্দু। তবে সমতা শব্দটি যদি শাব্দিক অর্থে কেবল ব্যবহার করা হয় তাহলে গতানুগতিকভাবে নারী কে পুরুষের সমান অধিকার পেতে হবে এই কথাটির বহিঃ প্রকাশ ঘটবে। এই ধারনার উৎপত্তিই হয়েছে এই সত্যতা থেকে যে সুযোগ সুবিধা, চাকুরী, পারিশ্রমিক, সম্পদ আহোরণ,স্বাস্থ্য, সিদ্ধান্ত গ্রহণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে নারী চরমভাবে অসম আচরণের শিকার হচ্ছে এবং এই জায়গা থেকে উত্তরণের রাস্তা হিসাবে দেখা হয় নারীকে পুরুষের মত অধিকার

পেতে হবে। সমস্যা এই খানেই যে, যখন নারীর অধিকার চর্চা কে পরিমাপ করা হয় male standards থেকে। নারী পুরুষ রয়েছে ভিন্নতা বা পার্থক্য এবং তা কোন ভাবে বৈষম্যের কারণ হতে পারে না।

সমতা যদি প্রকৃত অর্থে অর্জন হয় তাহলে অবশ্যই সেখানে বিরাজ করবে:

- Equality of opportunity
- Equality of access to opportunity
- Equality of Results.

এখানে উল্লেখ্য যে, যখনই নারীর সম অধিকারের কথা উঠেছে তখনই বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সমতাকে দেখা হয়েছে।

পাঠ উপকরণ-৮

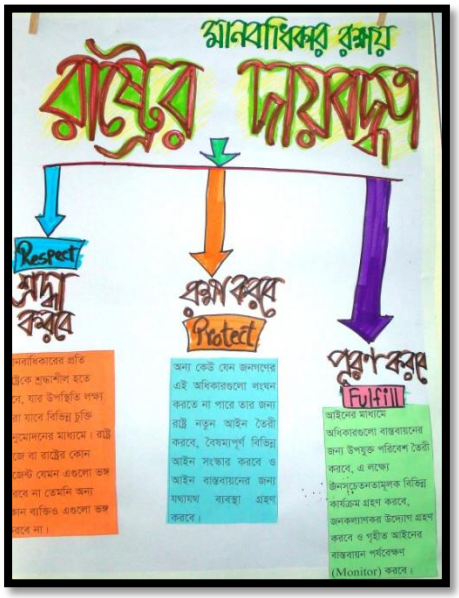

অধিকারের মধ্যেই কর্তব্য নিহিত থাকে (Rights imply duties)। অধিকার ও কর্তব্য একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ। কারো ন্যায়সঙ্গত দাবী স্বীকৃত হলেই সেটা হয় তার অধিকার। আর দাবীগুলো স্বীকার করার অর্থই হলো কিছু দায়িত্ব পালনের অঙ্গীকার করা। স্বীকৃতিদাতার অঙ্গীকারই হচ্ছে কর্তব্য বা বাধ্যবাধকতা। রাষ্ট্র যখন তার নাগরিকদের কোন দাবীকে স্বীকৃতি দিয়ে অধিকারে পরিণত করে তখন ঐ দাবী পূরণ করা রাষ্ট্রের কর্তব্য। রাষ্ট্রের কর্তব্য বা বাধ্যবাধকতাকে এক্ষেত্রে ৩টি ক্ষেত্রে বিন্যস্ত করা হয়েছে।

যথা:

- **শ্রদ্ধা (Respect):** মানবাধিকারের প্রতি রাষ্ট্রকে শ্রদ্ধাশীল হতে হবে, যার উপস্থিতি লক্ষ্য করা যাবে বিভিন্ন চুক্তি অনুমোদনের মাধ্যমে। রাষ্ট্র নিজে বা রাষ্ট্রের কোন এজেন্ট যেমন এগুলো ভঙ্গ করবে না তেমনি অন্য কোন ব্যক্তিও এগুলো ভঙ্গ করবে না।

- **রক্ষা (Protection):** অন্য কেউ যেন জনগণের এই অধিকারগুলো লংঘন করতে না পারে তার জন্য রাষ্ট্র নতুন আইন তৈরী করবে, বৈষম্যপূর্ণ বিভিন্ন আইন সংস্কার করবে ও আইন বাস্তবায়নের জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

- **পূরণ (Fulfill):** আইনের মাধ্যমে অধিকারগুলো বাস্তবায়নের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ তৈরী করবে, এ লক্ষ্যে জনসচেতনতামূলক বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করবে, জনকল্যাণকর উদ্যোগ গ্রহণ করবে ও গৃহীত আইনের বাস্তবায়ন পর্যবেক্ষণ (Monitor) করবে।

বিষয়টি ব্যক্তির ক্ষেত্রেও হতে পারে। যেমনটা বলেছেন অধ্যাপক লাস্কি - **'আমার নিরাপত্তার অধিকারের মধ্যে অপরের নিরাপত্তায় বিঘ্ন সৃষ্টি না করার কর্তব্য নিহিত আছে'**। আন্তর্জাতিক আইনের একটি নীতি হলো আমি আমার হাতদুটো ততটুকুই প্রসারিত করতে পারবো যতক্ষণ তা অন্যের ক্ষতি না করে, যা **open arm** নীতি নামে পরিচিত।

পাঠ উপকরণ-৯

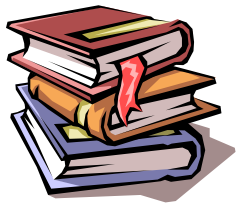

The CEDAW Convention

সমতার পথে যাত্রা

১৯৭৯ সালের ১৮ই ডিসেম্বর বিশ্বব্যাপী নারীর প্রতি বিদ্যমান বৈষম্য দূর করে নারী-পুর"ষের সমতা অর্জন এবং নারী অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে গৃহীত হয় নালীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদ। ২০০৬ সালের নভেম্বর মাসের ২ তারিখ পর্যন্ড় পাওয়া তথ্য থেকে দেখা যায় এ পর্যন্ড় ১৮৫ টি রাষ্ট্র CEDAW সনদের স্বাক্ষর করেছে। লিঙ্গভিত্তিক নির্যাতনের রক্ষা করণ এবং নারীর মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় হাতিয়ার হিসাবে CEDAW সনদ এখন বিশ্বজুড়ে সরকারী বেসরকারী সব পর্যায়ের যে কোন কর্মকান্ডেই গুর"ত্বের সঙ্গে বিবেচিত এবং ব্যবহৃত হচ্ছে। যুগ যুগ ধরে নারীর প্রতি যে বৈষম্য চলে আসছে তা দূর করার জন্য দীর্ঘদিন ধরেই জাতিসংঘ চেষ্টা করে যাচ্ছে।

নিম্নে নারীর প্রতি বৈষম্য বিলোপে যে যাত্রা সংগঠিত হয় তার চিত্র দেওয়া হলঃ

Year	International Treaties/ Conferences
1946	Commission for the Status of Women (CSW)

1948	**The Universal Declaration of Human Rights proclaims "the equal and inalienable rights of all members of the human family."**
1949	**Convention for the Suppression of the Traffic in Persons and of the Exploitation of the Prostitution of others**
1951	**ILO Convention 100 on Equal Remuneration**
1952	**Convention on Political Rights of the Women**
1956	**Supplementary Convention on the Abolition of Slavery**
1957	**Convention on the Nationality of Married Women**
1962	**Convention on Consent to Marriage, Minimum Age of Marriage and Registration of Marriages**
1966	**International Covenant on Civil and Political Rights**
1966	**International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights**
1974	**Declaration on the Protection of Women and Children in Emergency and Armed Conflict**
1975	**The First United Nations Women's Conference in Mexico City establishes the women's movement as a global phenomenon, and launches the UN Decade for Women**.
1979	**The Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women (CEDAW) calls on nations "to modify the social and cultural patterns of conduct of men and women…which are based on the idea of inferiority or superiority of the sexes."**
1980	**The Second United Nations Women's Conference in Copenhagen first addresses the issue of women and development.**
1985	**The Third United Nations Women's Conference in Nairobi helps to catalyze the emergence of women's NGOs worldwide.**
1993	**Women's groups at the World Conference on Human Rights in Vienna declare that women's rights are human rights, and human rights are women's rights.**
1995	**The Fourth World Conference on Women in Beijing, calls for gender issues to be fully mainstreamed into government policies and actions - making women full and equal partners in society - and creating a strong platform for action and advocacy for women.**
2000	**Women mobilize in New York for Women 2000: Beijing +5, to hold governments accountable for the commitments they made at Beijing, and to address new issues of domestic violence, trafficking, HIV/AIDS and globalization.**
2005	**BEIJING +10 NEWS ALERT!!! THE COMMISSION ON THE STATUS OF WOMEN UNEQUIVOCALLY REAFFIRMS THE BEIJING PLATFORM FOR ACTION**

নারীর অধিকার

জাতিসংঘের মৌলিক নীতির একটি হলো নারী অধিকারের সমতা। জাতিসংঘ সনদের প্রস্তাবনা দ্বারা প্রতিষ্ঠানটির মূল লক্ষ্য মৌলিক মানবাধিকারের উপর আস্থা, মানুষের মূল্য ও মর্যাদা এবং নারী-পুরুষের সম অধিকারের পুনব্যক্তকরণ নিশ্চিত করা হয়েছে। অনুচ্ছেদ-১ এর ঘোষণা মতে জাতিসংঘের কর্মকান্ডসমূহের মধ্যে অন্যতম হলো মানবাধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাবোধের উৎকর্ষ সাধন ও উৎসহ প্রদান এবং লিঙ্গ বিষয়ক পার্থক্য না করে সকলের জন্য মৌলিক স্বাধীনতা নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা অর্জন করা। সনদের শর্তের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত মানবাধিকার এবং নারী পুরুষের সম অধিকারের বিশেষ উল্ল্যেখপূর্বক প্রথম আন্তর্জাতিক দলিলে বলা আছে যে জাতিসংঘের সকল সদস্য সকল মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতার পূর্ণ বাস্তবায়নে আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যেতে আইনত বাধ্য, নারী পুরুষের মধ্যে সমতাবিধানের লক্ষ্য অর্জনসহ মানবাধিকারের অবস্থান এভাবে উন্নীত হয়েছে। নীতিগতভাবে এটি সকল সরকার এবং জাতিসংঘের কাছে চুক্তিভিত্তিক বাধ্যবাধকতায় পরিণত হয়েছে।

মানবাধিকারের আন্ড়র্জাতিক বিল নারীদের মানবাধিকারের উপর গুরুত্ব প্রদানকে জোরদার ও সম্প্রসারিত করেছে। মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণা মতে আইনের চোখে সবাই সমান এবং সকলেই কোন প্রকার বৈষম্য ছাড়াই মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতায় সুখ উপভোগ করতে পারবে এবং এমন অনৈতিক বৈষম্যের মধ্যে থেকে লিঙ্গকে অন্তর্ভুক্ত করতে পারবে। অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার এবং নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকারের আন্তর্জাতিক চুক্তিপত্র যাদের উভয়ই ১৯৬৬ সাল সংঘটিত হয়, তাতে পরিষ্কারভাবে বলা আছে প্রাথমিকভাবে প্রবর্তিত অধিকারগুলো কোন প্রকার বৈষম্য ছাড়াই সবার জন্য প্রযোজ্য হবে এবং অনৈতিক বৈষম্যের বিষয় হিসাবে লিঙ্গের আলোচনার বিকাশ ঘটবে, অধিকন্তু রাষ্ট্রগুলোকে প্রত্যেক চুক্তিপত্র গ্রহণে বিশেষভাবে রাজি করাতে এবং দৃঢ়ভাবে অনুমোদনে বাধ্য করা হয় যাতে তাদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত সকল অধিকারের সুবিধা নারী পুরুষ উভয়েই সমানভাবে পায়।

সম্পর্কিত মানবাধিকার চুক্তির সমন্বয়ে গঠিত আন্তর্জাতিক মানবাধিকার বিলে এভাবে ব্যাপক অধিকারের সমন্বয় ঘটানো হয়েছে যেখানে নারীসহ সকল ব্যক্তিই সমান সুযোগ লাভের অধিকারী হবে। যা হোক, আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত অধিকারগুলো উপভোগের নিশ্চয়তা বিধানের ক্ষেত্রে নারীদের মানবতা অপর্যাপ্ত বলে প্রমাণিত হয়েছে। নারীদের অবস্থান সম্পর্কিত কমিশন এর প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে লিঙ্গের ভিত্তিতে এসব দলিলে অবৈষম্যকণের নিশ্চয়তা বিধানকে সংজ্ঞায়িত করার চেষ্টা করেছে। CSW এর কর্মতৎপরতার ফলে নারীদের মানবাধিকার রক্ষা ও উন্নয়নে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা ও চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে।

প্রকৃতপক্ষে ১৯৪৬ সালে মানবাধিকার কমিশনের উপ কমিশন হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে নারী কর্মীদের প্রদর্শিত চাপের মুখে পূর্ণাঙ্গ কমিশনের মর্যাদা লাভের অধিকারী CSW নির্দেশমালা তৈরী করে যেখানে নারী অধিকার বিষয়ক তাৎক্ষণিক মনোনিবেশযোগ্য জরুরী সমস্যার সামধান এবং নারী পুর"ষের সমান অধিকারের নিশ্চয়তা বিধান করবে এমন নীতির বাস্তবায়ন ও ঐরূপ নির্দেশমালার বাস্তবায়নে গৃহীত প্রস্তাবনার উন্নয়ন সাধন করা হয়। ১৯৪৯ থেকে ১৯৫৯ সালের মধ্যে কমিশন নারীদের রাজনৈতিক অধিকার বিষয়ক চুক্তির বিশদ ব্যাখ্যা দান করে যা ১৯৫২ সালের ২০ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত সাধারণ পরিষদে সম্মেলনের মাধ্যমে গৃহীত হয়। ১৯৫৭ সালে ২৯ জানুয়ারী অনুষ্ঠিত সম্মেলনের মাধ্যমে গৃহীত বিবাহিত মহিলাদের জাতীয়তা বিষয়ক চুক্তি, ১৯৬২ সালের ৭ নভেম্বর অনুষ্ঠিত সম্মেলনের মাধ্যমে গৃহীত বিবাহে সম্মতি, নূন্যতম বয়স ও বিবাহ নিবন্ধীকরণ সংক্রান্ত চুক্তি এবং ১৯৬৫ সালের ১ নভেম্বর বিবাহে সম্মতি, বিবাহের নূন্যতম বয়স এবং বিবাহ নিবন্ধীকরণ সংক্রান্ত নির্দেশমালা গৃহীত হয়। যেসব অঞ্চলে কমিশন মনে করে যে এসব অধিকার খর্বিত হতে পারে সেখানেই এসব চুক্তির প্রত্যেকটিই নারী অধিকার রক্ষায় ও উৎকর্ষ সাধনে ভূমিকা রেখেছে। কিন্তু এটা বিশ্বাস করা হতো যে ঐসব এলাকা বাদে সাধারণ মানবাধিকার চুক্তির দ্বারা নারী অধিকার সর্বাপেক্ষা সুরক্ষিত এবং উৎকর্ষিত হয়েছিল।

যদিও এসব দলিল নারীদের মানবাধিকার রক্ষা ও এর উন্নতি সাধনে জাতিসংঘ পদ্ধতির বর্ধমান স্পর্শ কাতরতারই বহিঃপ্রকাশ, তা সত্ত্বেও তাদের প্রচেষ্টা ছিল অসম্পূর্ণ, কেননা তারা ব্যাপকভাবে নারী বৈষম্য দূরীকরণে ব্যর্থ হয়েছে, অধিকন্তু উদ্বেগের বিষয় ছিল এই যে, বাস্তবিকপক্ষে সাধারণ মানবাধিকার ব্যবস্থা নারী মানবাধিকার রক্ষা ও উন্নয়নে ভালভাবে কাজ করছিল না।

এভাবে ১৯৬৩ সালের ৫ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত সাধারণ সম্মেলনে ১৯২১ প্রস্তাব গৃহীত হয় যেখানে এটি অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিচ্ছদকে অনুরোধ করে যাতে তারা CSW কে দিয়ে একটি খসড়া ঘোষণা তৈরী করিয়ে নেয় যা হবে আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন একক দলিল এবং এতে নারী-পুরুষের সমান অধিকারের স্পষ্ট ঘোষণা থাকবে। এই পদ্ধতি জাতিসংঘ ব্যবস্থার মধ্যে ও এর বাইরে নারী কর্মীদের দ্বারা সমর্থিত হয়েছিল। CSW থেকে বাছাইকৃত একটি কমিটির দ্বারা তৈরী ঘোষণার খসড়াকরণ শুরু হয় ১৯৬৫ সালে। চুড়ান্তভাবে ১৯৬৭ সালের ৭ নভেম্বর GA সাধারণ পরিষদ দ্বারা গৃহীত নারীদের বিরুদ্ধে সকল বৈষম্যের দূরীকরণ সংক্রান্ত ঘোষণা গৃহীত হয়। যদিও ঘোষণাটি শুধুমাত্র নৈতিক ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের সমপর্যায়ে চলে গিয়েছিল তবুও চুক্তির অধীনে শক্তির অনুপস্থিতিতে এর খসড়াকরণ ও কঠিন হয়ে পড়েছিল। বিবাহ ও পরিবারে সমতা বিষয়ক অনুচ্ছেদ ৬ এবং নিয়োগ সংক্রান্ত অনুচ্ছেদ ১০ উভয়েই বিতর্কের বিষয়ে পরিণত হয়ে গিয়েছিল কেননা প্রথা এবং বৈষম্যে

চিরস্থায়ীকরণ সংক্রান্ত আইনের বিলোপ সাধনের জন্য ঘোষণা করা হবে নাকি এদের উৎকর্ষ সাধন অথবা পরিবর্তন করা হবে এ নিয়ে প্রশ্নের সূত্রপাত ঘটেছিল।

ষাটের দশকে বিশ্বের বিভিন্ন অংশে নারীর বৈষম্যের ধরণ সংক্রান্ত নতুন চিন্তা ধারার আবির্ভাব লক্ষ্য করা যায় এবং অনেক প্রতিষ্ঠানের উত্থান লক্ষ্য করা যায়, যারা এমন বৈষম্যের ক্ষতিকর প্রভাবের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে প্রতিশ্রুতি বদ্ধ ছিল। এ সময় নারী বিষয়ক কিছু উন্নয়ন নীতির ক্ষতিকর প্রভাব ও স্পষ্ট হয়ে উঠে। ১৯৭২ সালে অর্থনৈতিক ও সামাজিক কমিশন কর্তৃক ঘোষনাপত্র গ্রহণের ৫ বছর পর এবং ঘোষণা পত্র বাস্ড়বায়নের স্বেচ্ছাসেবী প্রতিবেদন মূলক পদ্ধতি প্রবর্তনের ৪ বছর পর CSW একটি বাধ্যতামূলক চুক্তি সম্পাদনে সম্ভাব্যতা বিবেচনা করে। যা ঘোষণার প্রস্তুতি গ্রহণে স্বাভাবিক শক্তি যোগাবে এবং জাতিসংঘ ভুক্ত দেশগুলোকে এরূপ প্রস্তাবের উপর তাদের মতামত পেশ করতে জাতিসংঘ মহাসচিবকে বৈঠকে আহ্বানের অনুরোধ জানাতে সিদ্ধান্ড় নেয়। পরবর্তী বছরগুলোতে এ ধরণের চুক্তির বিশদভাবে বর্ণনা প্রদানের জন্য একটি কার্যকরি দলকে নিযোগ প্রদান করা হয়। ১৯৭৪ সালে এর ২৫তম সভায় এবং কার্যকরী দলের প্রতিবেদনের ভিত্তিতে কমিশন একক, সর্বাত্মক এবং আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত দলিল তৈরীর সিদ্ধান্ত নেয় যা নারী বৈষম্য দূর করবে। এই দলিল কোন পূর্ব অভিজ্ঞতা ছাড়াই তৈরী করা হয়েছিল। কেননা ভবিষ্যতে জাতিসংঘ ও এর অঙ্গ সংগঠনের দ্বারা এর নির্দেশমালায় যে কোন পরিবর্তন সাধিত হতে পারে।

১৯৭৬ সালে নারীর বিরুদ্ধে সকল ধরণের বৈষম্য দূরীকরণের নিমিত্তে সাধিত চুক্তির বিষয়বস্তু তৈরী হয়েছিল, কমিশনের কার্যকরী দলের দ্বারা এবং ১৯৭৭ থেকে ১৯৭৯ সালের মধ্যে সাধারণ সম্মেলনের তৃতীয় কমিটির কর্মী দলের দ্বারা ব্যাপক পরামর্শ গৃহীত হয়। কমিশনের খড়সা কাজকে বিশ্ব পরিকল্পনা পরিষদ উৎসাহিত করে। ১৯৭৫ সালে মেক্সিকো শহরে অনুষ্ঠিত বিশ্ব সম্মেলনে ঐ সালকে বিশ্ব নারী বর্ষ হিসাবে গ্রহণ করা হয়। নারীর বিরুদ্ধে বৈষম্য দূরীকরণে একটি সম্মেলন আহবান করা হয় যেখানে বাস্ড়বায়নের কার্যকর পদ্ধতির কথাও বলা হয়। সাধারণ সভার দ্বারা কাজকে উৎসাহিত করা হয় এবং এটা কমিশনকে ১৯৭৬ সালের মধ্যে কাজ সম্পাদনে প্ররোচিত করে। যাতে ১৯৮০ সালে কোপেন হেগেনে অনুষ্ঠিত মধ্য দেশীয় পর্যালোচনা সম্মেলনের পূর্বে তা সময় মত শেষ হয়ে যায়। যদি ও পরবর্তী বছরের আলোচনার বিষয়বস্তুর তৈরীতে দেরী করার জন্য পরামর্শ করা হয়েছিল। নারীর বিরুদ্ধে সকল ধরণের বৈষম্য বিলোপ সাধনে ১৯৭৯ সালে ১৩০-০ ও ১০ ভোট বর্জনের মাধ্যমে চুক্তিটি গৃহীত হয়। সাধারণ সম্মেলনে প্রস্তাব ৩৪/১৮০ এর ভিত্তিতে চুক্তি গৃহীত হয়। সম্মেলনে আশাবাদ ব্যক্ত করা হয় যে চুক্তিটি শীঘ্রই কার্যকর হবে এবং জাতিসংঘ মহাসচিবকে চুক্তির আলোচ্য বিষয় বস্তু মধ্যদেশীয় বিশ্ব সম্মেলনে জাতিসংঘ নারী দশককে উপস্থাপনের জন্য অনুরোধ করা হয়।

১৯৮০ সালের ১৭ ই জুলাই কোপেনহেগেন সম্মেলনের বিশেষ অনুষ্ঠানে ৬৪ টি দেশ চুক্তিতে স্বাক্ষর করে এবং ২টি দেশ দলিলে তাদের অনু সমর্থন প্রদান করে। ১৯৮১ সালের ৩ সেপ্টেম্বর ২০ তম সদস্য দেশ চুক্তিতে অনু সমর্থনের ৩০ দিন পরে চুক্তিটি বাস্তব রূপ নিতে লাগল। এটা অন্যান্য পূর্ববর্তী মানবাধিকার চুক্তির চেয়ে অনেক দ্রুত অগ্রসর হতে লাগল। এবং এভাবে জাতিসংঘের প্রতিষ্ঠায় ব্যাপকভাবে মহিলাদের জন্য আন্তর্জাতিক বৈধ মান নিরূপণে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিল।

নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদ (সিডও)

Convention on the Elimination of all Forms of

Discrimination Against Women (CEDAW)

- ১৯৪৮ সালের ১০ই ডিসেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণাপত্র গ্রহণ ও জারী করে। এই ঘোষণায় বর্ণিত অধিকার নারী ও পুরুষভেদে সকল মানুষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কিন্তু দেখা যায় এই ঘোষণায় নারীর বিশেষ কিছু অধিকার উপেক্ষিত হয়েছে যা কেবলমাত্র নারীর জন্য প্রযোজ্য।
- মানবাধিকারের ঘোষণায় নারীর এ সকল অধিকার উপেক্ষিত হওয়ার কারণে তারা নির্যাতিত ও বঞ্চিত হচ্ছে তাদের অধিকার থেকে। নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা, তাদের অগ্রগতি এবং উন্নয়নের লক্ষ্যে জাতিসংঘ ১৯৭৫ সালকে **'বিশ্ব নারী বর্ষ'** হিসাবে ঘোষনা করে।

- এ সময় নারীর উন্নয়ন ও বিকাশের জন্য বিশ্বব্যাপী বাস্ড়বসম্মত কাজের পরিকল্পনা গ্রহণ ও কর্মসূচী হাতে নেয়া হয়। কিন্তু নারী বর্ষ শেষে দেখা গেল নারীর উন্নয়ন ও বিকাশের জন্য এক বছর সময় খুবই কম। এই উপলব্ধির পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৭৬-১৯৮৫ সাল পর্যন্ড় এই এক দশক কালকে নারী উন্নয়ন দশক ঘোষণা করা হয়। এই উন্নয়ন কর্মসূচীর ফলশ্র“তিতে নারী ও পুর“ষের মধ্যে বিরাজমান সকল প্রকার বৈষম্য দূর করে সম অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ১৯৭৯ সালে ১৮ই ডিসেম্বর "নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদ" গৃহীত হয়।
- ১৯৮০ সালের ১লা মার্চ সনদে সাক্ষর শুর“ হয়।
- ১৯৮১ সালের ৩রা সেপ্টেম্বর থেকে এ সনদ কার্যকর হয়।
- বাংলাদেশ ১৯৮৪ সালে সিডো সনদ স্বাক্ষর ও অনুমোদন করেন।
- বাংলাদেশ স্বাক্ষরের সময় সনদের অনুঃ ২ ও ১৩(ক) ও অনুঃ ১৬ (গ) (চ) সংরক্ষণ রেখেছিল।
- পরবর্তীতে ২ এবং ১৬ (গ) সংরক্ষিত রেখে বাকী অনুচেছদগুলো থেকে সংরক্ষণ তুলে নেয়া হয়।
- এই সনদে মোট ৩০টি অনুচ্ছেদ আছে। এই অনুচ্ছেদগুলোর মধ্যে ৩-১৬ পর্যন্ড় মোট ১৪টি নারীর অধিকার সংক্রান্ড় এবং বাকীগুলো এর কর্মপন্থা ও দায়িত্ব সংক্রান্ড়।

সিডও সনদের ১-১৬ অনুচ্ছেদগুলো ধারাবাহিকভাবে নিম্নে উলেণ্ডখ করা হলঃ

ধারা ১

এই সনদে, "নারীর প্রতি বৈষম্য" বলতে বুঝাবে পুর“ষ-নারী ভিত্তিতে যে কোনো পার্থক্য, বঞ্চনা অথবা বিধিনিষেধ যার মানবাধিকার এবং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, নাগরিক অথবা অন্য যে কোনো ক্ষেত্রে মৌলিক স্বাধীনতা স্বীকার করে নেয়া, তা ভোগ করা, অথবা বৈবাহিক অবস্থা নির্বিশেষে, পুর“ষ ও নারীর সমতার ভিত্তিতে নারীর দ্বারা তার ব্যবহার বা চর্চা, ক্ষতিগ্রস্থ অথবা রদকরার মত প্রভাব বা উদ্দেশ্য রয়েছে।

ধারা ২

সিডও সনদে শরীক রাষ্ট্রসমূহ নারীর প্রতি সকল প্রকারের বৈষম্যের নিন্দা করে এবং উপযুক্ত সকল উপায় ও অবিলম্বে নারীর প্রতি বৈষম্য দূরীকরণের একটি নীতি অনুরণে সম্মত হয়। এই লক্ষ্যে, তারা যা যা করবে বলে অঙ্গীকার করে, তা হচ্ছেঃ

(ক) পুর“ষ ও নারীর সমতার নীতি তাদের জাতীয় সংবিধান অথবা অন্য কোনো উপযুক্ত আইনে ইতিমধ্যেই অন্ড়র্ভুক্ত না হয়ে থাকলে তা অন্ড়র্ভুক্ত করা এবং আইনের মাধ্যমে ও অন্যান্য উপযুক্ত উপায়ে এই নীতির প্রকৃত বাস্ড়বায়ন নিশ্চিত করা;

(খ) নারীর প্রতি সকল ধরণের বৈষম্য নিষিদ্ধ ক'রে, উপযুক্ত ক্ষেত্রে আইন মানতে বাধ্য করার ব্যবস্থাসহ, যথোপযুক্ত আইনগত ও অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণ কর;

(গ) পুর“ষের সঙ্গে সমতার ভিত্তিতে নারীর অধিকারসমূহের সুরক্ষা আইনগতভাবে প্রতিষ্ঠা করা এবং উপযুক্ত জাতীয় আদালত ও অন্যান্য সরকারী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে যে কোনো বৈষম্য থেকে নারীকে রক্ষা কার্যকরভাবে নিশ্চিত করা;

(ঘ) নারীর প্রতি বৈষম্যমূলক যে কোনো কর্মকান্ডে নিয়োজিত হওয়া থেকে বিরত থাকা এবং সরকারী কর্তৃপক্ষ ও প্রতিষ্ঠানসমূহ যাতে এই দায়িত্ব অনুসারে কাজ করে, তা নিশ্চিত করা;

(ঙ) কোন ব্যক্তি, সংগঠন বা প্রতিষ্ঠান যাতে নারীর প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ করতে না পারে তা নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে সকল উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা;

(চ) প্রচলিত যেসব আইন, বিধি, প্রথা ও অভ্যাস নারীর প্রতি বৈষম্য সৃষ্টি করে, সেগুলো পরিবর্তন অথবা বাতিল করার উদ্দেশ্যে আইন প্রণয়নসহ সকল উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা;

(ছ) যে সব জাতীয় দ" বিধান নারীর প্রতি বৈষম্য সৃষ্টি করে, সেগুলো বাতিল করা।

ধারা-৩

পুর"ষের সঙ্গে সমতার ভিত্তিতে মানবাধিকার ও মৌলিক অধিকারসমূহ প্রয়োগ ও ভোগে নারীকে নিশ্চয়তা প্রদানের উদ্দেশ্যে এবং নারীর পূর্ণ উন্নয়ন ও অগ্রগতি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে, শরীক রাষ্ট্রসমূহ সকল ক্ষেত্রে, বিশেষ করে রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে আইন প্রণয়নসহ সকল উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

ধারা-৪

১। পুর"ষ ও নারীর মধ্যে প্রকৃত প্রস"ভাবে সমতা ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে, শরীক রাষ্ট্রসমূহ কোনো অস্থায়ী বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করলে তা এই সনদে বর্ণিত সংজ্ঞা অনুযায়ী বৈষম্য হিসাবে বিবেচনা করা হবে না, তবে এসব ব্যবস্থা গ্রহণ কোনোভাবেই অসম অথবা পৃথক মান বজায় রাখার ফল হিসাবে যুক্ত হবে না; সুযোগ ও আচরণের সমতার লক্ষ্য অর্জিত হলে এসব ব্যবস্থা রহিত করা হবে।

২। শরীক রাষ্ট্রসমূহ মাতৃত্ব রক্ষার লক্ষ্যে এই সনদে বর্ণিত ব্যবস্থাসহ কোনো বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করলে তা বৈষম্যমূলক বলে বিবেচিত হবে না।

ধারা-৫

শরীক রাষ্ট্রসমূহ নিচে যেসব বিষয় বর্ণনা করা হয়েছে সেগুলোর জন্য সকল উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবেঃ

(ক) পুর"ষ ও নারীর মধ্যে কেউ উৎকৃষ্ট অথবা কেউ নিকৃষ্ট, এই ধারণার ভিত্তিতে কিংবা পুর"ষ ও নারীর চিরাচরিত ভূমিকার ভিত্তিতে যে সব কুসংস্কার, প্রথা ও অভ্যাস গড়ে উঠেছে সেগুলো দূর করার লক্ষ্যে পুর"ষ ও নারীর সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আচরণের ধরণ পরিবর্তন করা;

(খ) মাতৃত্বকে একটি সামাজিক কাজ হিসাবে যথাযথভাবে বিবেচনা এবং সকল ক্ষেত্রে শিশুদের স্বার্থই মূল বিবেচ্য বিষয় এ কথা স্মরণ রেখে সন"ান-সন"তির লালন-পালন ও উন্নয়ণে পুর"ষ ও নারীর অভিন্ন দায়িত্বের স্বীকৃতির বিষয় যাতে পারিবারিক শিক্ষায় অন"র্ভুক্ত করা হয়, তা নিশ্চিত করা।

ধারা-৬

শরীক রাষ্ট্রসমূহ নারীকে নিয়ে সব ধরণের অবৈধ ব্যবসা এবং দেহ ব্যবসার আকারে নারীর শোষণ দমন করার লক্ষ্যে আইন প্রণযনসহ সকল উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

পরিচ্ছেদ ২

ধারা-৭

শরীক রাষ্ট্রসমূহ দেশের রাজনৈতিক ও জন জীবনে নারীর প্রতি বৈষম্য দূরীকরণে সকল উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে এবং বিশেষ করে, পুর"ষের সঙ্গে সমান শর্তে, যে সব ক্ষেত্রে নারীর অধিকার নিশ্চিত করবে সেগুলো হচ্ছেঃ

(ক) সকল নির্বাচন ও গণভোটে ভোটদান এবং জনগণের দ্বারা নির্বাচিত সংস্থা সমূহের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় উপযুক্ত বিবেচিত হওয়া;

(খ) সরকারী নীতি প্রণয়ন ও তা বাস্ড়বায়নে অংশগ্রহণ এবং সরকারী পদে অধিষ্ঠিত হওয়া ও সরকারের সকল পর্যায়ে সরকারী কাজকর্ম সম্পাদন;

(গ) দেশের জনজীবন ও রাজনৈতিক জীবনের সঙ্গে সংশিণ্টষ্ট বেসরকারী সংস্থা ও সমিতি সমূহের কাজে অংশগ্রহণ।

ধারা-৮

শরীক রাষ্ট্রসমূহ, পুর"ষের সঙ্গে সমান শর্তে এবং কোনো রকম বৈষম্য ছাড়াই, নারীর জন্য আন্ড়র্জ্জাতিক পর্যায়ে নিজ নিজ সরকারের প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ এবং আন্ড়র্জ্জাতিক সংস্থাসমূহের কাজ-কর্মে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে সকল উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

ধারা-৯

১। শরীক রাষ্ট্রসমূহ জাতীয়তা অর্জন, পরিবর্তন অথবা তা বজায় রাখতে নারীকে পুর"ষের মতই সমান অধিকার প্রদান করবে। রাষ্ট্রসমূহ বিশেষ করে নিশ্চিত করবে যে একজন বিদেশীর সঙ্গে বিবাহ অথবা বিবাহ চলাকালে স্বামীর জাতীয়তা পরিবর্তনের ফলে স্বাভাবিক পরিণতি হিসাবে স্ত্রীর জাতীয়তা পরিবর্তিত হবে না, তাঁকে জাতীয়তাহীন করবে না অথবা স্বামীর জাতীয়তা গ্রহণে তাঁকে বাধ্য করা হবে না।

২। শরীক রাষ্ট্রসমূহ, নারীকে তাঁর সন্ড়ান-সন্ড়তির জাতীয়তার ক্ষেত্রে পুর"ষের মতই সমান অধিকার প্রদান করবে।

পরিচ্ছেদ ৩

ধারা-১০

শিক্ষা ক্ষেত্রে নারী ও পুর"ষের সমান অধিকার নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে, বিশেষ করে পুর"ষ ও নারীর সমতার ভিত্তিতে যেসব বিষয় নিশ্চিত করার লক্ষ্যে শরীক রাষ্ট্রসমূহ নারীর প্রতি বৈষম্য দূরীকরণের জন্য সকল উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে, সেগুলো হচ্ছেঃ

ক) কর্মজীবন ও বৃত্তিমূলক নির্দেশনা, পলণ্টী ও শহরাঞ্চলে সকল ধরণের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা গ্রহণ ও ডিপেণ্টামা লাভের সুযোগের জন্য একই শর্তাবলী; স্কুল-পূর্ব, সাধারণ, কারিগরী, পেশাগত ও উচ্চতর কারিগরী শিক্ষা, সেই সাথে সকল ধরণের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণে এই সমতা নিশ্চিত করা।

খ) সহশিক্ষা এবং পুর"ষ ও নারীর ভূমিকা সম্পর্কিত চিরাচরিত ধারণা দূরীকরণের লক্ষ্য অর্জনে সহায়ক অন্য ধরণের শিক্ষা উৎসাহিত করার মাধ্যমে, বিশেষ করে পাঠ্যপুস্ড়ক ও বিদ্যালয় কর্মসূচী সংশোধন এবং উপযুক্ত শিক্ষা পদ্ধতি গ্রহণের মাধ্যমে সকল পর্যায়ে এবং সকল ধরণের শিক্ষায় পুর"ষ ও নারীর ভূমিকা সম্পর্কিত চিরাচরিত যে কোনো ধারণা দূরীকরণ;

গ) বৃত্তি এবং অন্যান্য শিক্ষা মঞ্জুরী থেকে লাভবান হওয়ার একই সুযোগ প্রদান;

ঘ) বয়স্ক ও কর্মমূলক শিক্ষা কর্মসূচীসহ শিক্ষা অব্যাহত রাখার কর্মসূচী, বিশেষ করে পুর"ষ ও নারীর মধ্যে শিক্ষা ক্ষেত্রে বিরাজমান যে কোনো দুরত্ব সম্ভব স্বল্পতম সময়ের মধ্যে কমিয়ে আনার লক্ষ্যে প্রণীত কর্মসূচীসমূহে সুযোগ লাভের একই সুবিধা প্রদান;

ঙ) ছাত্রীদের বিদ্যালয় ত্যাগের হার কমানো এবং যেসব বালিকা ও মহিলা নির্দিষ্ট সময়ের আগেই বিদ্যালয় ত্যাগ করেছেন, তাদের জন্য বিভিন্ন কর্মসূচীর আয়োজন;

চ) খেলাধূলা ও শারীরিক শিক্ষায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণের জন্য একই সুযোগ প্রদান;

ছ) পরিবারের স্বাস্থ্য ও কল্যাণ নিশ্চিত করতে সহায়তা করার উদ্দেশ্যে পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কিত তথ্য ও পরামর্শসহ নির্দিষ্ট শিক্ষামূলক তথ্য পাওয়ার সুযোগ সৃষ্টি।

ধারা-১১

১। পুরুষ ও নারীর সমতার ভিত্তিতে তাদের একই অধিকার, বিশেষ করে নিম্নে বর্ণিত অধিকারসমূহ, নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সর্ব প্রকার নিয়োগ দানের ক্ষেত্রে শরীক রাষ্ট্রসমূহ নারীর প্রতি বৈষম্য দূরীকরণের জন্য সকল উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে;

ক) সকল মানুষের মৌলিক কর্মসংস্থানের অধিকার;

খ) কর্মে নিয়োগের ক্ষেত্রে একই বাছাই মান প্রয়োগসহ একই নিয়োগ সুবিধা পাওয়ার অধিকার;

গ) পেশা ও চাকুরী স্বাধীনভাবে বেছে নেয়ার অধিকার; পদোন্নতি, চাকুরীর নিরাপত্তা এবং চাকুরীর সকল সুবিধা ও শর্ত ভোগ করার অধিকার এবং শিক্ষানবীস হিসাবে প্রশিক্ষণ, উচ্চতর বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ ও পুণঃপ্রশিক্ষণ গ্রহণের অধিকার;

ঘ) বিভিন্ন সুযোগ সুবিধাসহ সমান পারিশ্রমিক, একই মানের কাজের ক্ষেত্রে একই আচরণ, সেই সাথে কজের মান মূল্যায়নের ক্ষেত্রে সমান আচরণ পাওয়ার অধিকার;

ঙ) বিশেষ করে অবসর গ্রহণ, বেকারত্ব, অসুস্থতা, অক্ষমতা ও বার্ধক্য এবং কাজ করার অন্যান্য অক্ষমতার ক্ষেত্রে সামাজিক নিরাপত্তার অধিকার এবং সেই সাথে সচেতন ছুটি ভোগের অধিকার;

চ) সন্তান জন্মদান প্রক্রিয়া নিরাপদ রাখাসহ স্বাস্থ্য রক্ষা এবং কাজের পরিবেশে নিরাপত্তার অধিকার।

২। বিবাহ অথবা মাতৃত্বের কারণে নারীর প্রতি বৈষম্য রোধ এবং তাঁদের কাজ করার কার্যকর অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে শরীক রাষ্ট্রসমূহ যে সকল বিষয়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে, সেগুলো হচ্ছেঃ

ক) গর্ভধারণ অথবা মাতৃত্ব সংক্রান্তছুটির কারণে বরখাস্তএবং বৈবাহিক অবস্থার ভিত্তিতে বরখাস্তকরার ক্ষেত্রে বৈষম্য নিষিদ্ধ করা;

খ) বেতনসহ ছুটি অথবা পূর্বেকার চাকুরী, জেষ্ঠতা অথবা সামাজিক ভাতাদি না হারিয়ে তুলনাযোগ্য সামাজিক সুবিধাদিসহ মাতৃত্ব সংক্রান্তছুটি প্রবর্তন করা;

গ) বিশেষ করে একটি শিশু পরিচর্যা সুবিধা নেটওয়ার্ক প্রতিষ্ঠা ও উন্নয়নের মাধ্যমে, পিতা-মাতাদেরকে তাদের কাজের দায়িত্বের সঙ্গে পারিবারিক দায়িত্ব সংযুক্ত করে নাগরিক জীবনে অংশগ্রহণে সক্ষম করে তোলার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সহায়ক সামাজিক সার্ভিসের ব্যবস্থা উৎসাহিত করা;

ঘ) গর্ভাবস্থায় যে ধরণের কাজ নারীর জন্য ক্ষতিকর বলে প্রমাণিত, গর্ভকালে তাঁদেরকে সে ধরণের কাজ থেকে বিশেষভাবে রক্ষার ব্যবস্থা করা।

৩। এই ধারায় বর্ণিত বিষয়াদি সম্পর্কে রক্ষামূলক আইন, বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত জ্ঞানের আলোকে সময় সময় পর্যালোচনা করা হবে এবং প্রয়োজনমত সংশোধন, বাতিল অথবা সম্প্রসারণ করা হবে।

ধারা-১২

১। পুরুষ ও নারীর সমতার ভিত্তিতে, পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কিত সার্ভিসসহ স্বাস্থ্য পরিচর্যামূলক সার্ভিস পাওয়ার সুবিধা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে শরীক রাষ্ট্রসমূহ, স্বাস্থ্য সেবার ক্ষেত্রে নারীর প্রতি বৈষম্য দূর করার জন্য সকল উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

২। একই ধারার অনুচ্ছেদ-১ এর বিধান ছাড়াও শরীক রাষ্ট্রসমূহ, প্রয়োজনের ক্ষেত্রে বিনামূল্যে সার্ভিস প্রদান করে সেই সাথে গর্ভাবস্থায় ও শিশুকে মায়ের দুগ্ধদান চলাকালে পর্যাপ্ত পুষ্টির ব্যবস্থা করে গর্ভাকাল, সন্ড়ন জন্মদানের ঠিক আগে এবং সন্ড়ন জন্মদানের পরে মহিলাদের উপযুক্ত সার্ভিস প্রদান নিশ্চিত করবে।

ধারা-১৩

শরীক রাষ্ট্রসমূহ, পুর"ষ ও নারীর সমতার ভিত্তিতে, একই অধিকার, বিশেষ করে নিম্নলিখিত অধিকারসমূহ, নিশ্চিত করার লক্ষ্যে অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনের অপরাপর ক্ষেত্রে নারীর প্রতি বৈষম্য দূর করার জন্য সকল উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে;

ক) পরিবারিক কল্যাণের অধিকার;

খ) ব্যাংক ঋণ, বন্ধক ও অন্যান্য আর্থিক ঋণ গ্রহণের অধিকার;

গ) বিনোদনমূলক কর্মকান্ড, খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক জীবনের সকল বিষয়ে অংশগ্রহণের অধিকার।

ধারা-১৪

১। শরীক রাষ্ট্রসমূহ, পলণ্ডী এলাকার মহিলারা যে সব বিশেষ সমস্যার সম্মুখীন হন, সেগুলো এবং দৈনন্দিন জীবনে তাঁদের যেসব কাজ উপার্জন হিসাবে গণ্য করা হয় না সেসব কাজ এবং পরিবারের অর্থনৈতিক কার্যক্রমে তাঁরা গুর"ত্বপূর্ণ যেসব ভূমিকা পালন করেন, সেগুলো বিবেচনা করবে, এবং পলণ্ডী এলাকার নারীদের জন্য এই সনদের বিধান প্রয়োগ নিশ্চিত করতে সকল উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

২। শরীক রাষ্ট্রসমূহ, পুর"ষ ও নারীর সমতার ভিত্তিতে, পলণ্ডী উন্নয়ন কর্মকান্ডে নারীর অংশগ্রহণ, ও তা থেকে তাঁদের কল্যাণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে, পলণ্ডী এলাকায় নারীর প্রতি বৈষম্য দূরীকরণে সকল উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে, এবং বিশেষ করে, এসব নারীর জন্য নিম্নলিখিত অধিকারসমূহ নিশ্চিত করবেঃ

ক) সকল পর্যায়ে উন্নয়ন পরিকল্পনা সম্প্রসারণ ও বাস্ড়বায়নে অংশগ্রহণ করা;

খ) পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ে তথ্য, পরামর্শ ও সেবা লাভসহ পর্যাপ্ত স্বাস্থ্য সেবা সুবিধা লাভের সুযোগ পাওয়া;

গ) সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচী থেকে সরাসরি লাভবান হওয়া;

ঙ) কর্মসংস্থান অথবা স্ব-কর্মসংস্থানের মাধ্যমে অর্থনৈতিক সুবিধাদি লাভের সমান সুযোগ পাওয়ার উদ্দেশ্যে স্ব-সাহায্য গ্র"প ও সমবায় সংগঠিত করা;

চ) সকল সামাজিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করা;

ছ) কৃষি ঋণ ও অন্যান্য ঋণ, বাজারজাতকরণ সুবিধা ও উপযুক্ত প্রযুক্তি লাভের সুযোগ পাওয়া এবং ভূমি ও কৃষি সংস্কার ও সেই সাথে তুমি পুনরবন্টন স্কীমের ক্ষেত্রে সমান অধিকার লাভ করা;

জ) বিশেষ করে গৃহায়ন, পয়ঃনিস্কাশন, বিদ্যুৎ ও পানি সরবরাহ, পরিবহন ও যোগাযোগ ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত বসবাস সুবিধা ভোগ করা।

পরিচ্ছদ ৪

ধারা-১৫

১। শরীক রাষ্ট্রসমূহ আইনের দৃষ্টিতে নারী ও পুরুষকে সমপক্ষ হিসাবে বিবেচনা করবে।

২। শরীক রাষ্ট্রসমূহ বিভিন্ন নাগরিক বিষয়ে নারীকে পুরুষের বৈধ ক্ষমতার অনুরূপ ক্ষমতা প্রদান করবে এবং সেই ক্ষমতা প্রয়োগের জন্য একই সুযোগ দেবে। বিশেষ করে রাষ্ট্রসমূহ নারীকে চুক্তি সম্পাদনে ও সম্পত্তি দেখাশোনার সমান অধিকার দেবে এবং আদালত ও ট্রাইবুনালে কার্যক্রমের সকল স্ড়রে তাঁদের সঙ্গে সমান আচরণ করবে।

৩। শরীক রাষ্ট্রসমূহ নারীর বৈধ ক্ষমতা সংকুচিত করার লক্ষ্যে প্রণীত আইন ভিত্তিক সকল চুক্তি ও যে কোনো ধরণের ব্যক্তিগত দলিল বাতিল করবে।

৪। শরীক রাষ্ট্রসমূহ সকল নাগরিকের চলাচল এবং আবাসস্থল ও বসতি স্থাপন বেছে নেয়ার ব্যাপারে তাদের স্বাধীনতা সম্পর্কিত আইনের ক্ষেত্রে পুরুষ ও নারীকে সমান অধিকার দেবে।

ধারা-১৬

১। শরীক রাষ্ট্রসমূহ, বিবাহ ও পারিবারিক সম্পর্ক বিষয়ক সকল ক্ষেত্রে নারীর প্রতি বৈষম্য দূরীকরণে সকল উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে এবং পুরুষ ও নারীর সমতার ভিত্তিতে বিশেষ করে যেসব বিষয় নিশ্চিত করবে, সেগুলো হচ্ছেঃ

ক) বিবাহে আবদ্ধ হওয়ার জন্য একই অধিকার;

খ) স্বাধীনভাবে স্বামী/স্ত্রী হিসাবে সঙ্গী বেছে নেয়ার এবং তাঁদের স্বাধীন ও পূর্ণ সম্মতিতে বিবাহে আবদ্ধ হওয়ার জন্য একই অধিকার;

গ) বিবাহ এবং এর বিচ্ছেদকালে একই অধিকার ও দায়িত্ব;

ঘ) তাঁদের বৈবাহিক অবস্থা নির্বিশেষে, তাঁদের সন্ড়ান-সন্ড়তির বিষয়ে, পিতা-মাতা হিসাবে একই অধিকার ও দায়িত্ব; সকল ক্ষেত্রে শিশুদের স্বার্থই হবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়;

ঙ) তাঁদের সন্ড়ান সংখ্যা কত হবে ও সন্ড়ান জন্মদানে কতটা বিরতি দেয়া হবে সে বিষয়ে স্বাধীনভাবে ও দায়িত্বের সঙ্গে সিদ্ধান্ড়গ্রহণ এবং বিভিন্ন অধিকার প্রয়োগে সক্ষমতা অর্জনের জন্য তথ্য, শিক্ষা ও উপায় লাভের একই অধিকার;

চ) অভিভাবকত্ব, প্রতিপালকত্ব, ট্রাস্টিশীপ ও পোষ্যসন্ড়ান গ্রহণ, অথবা অনুরূপ ক্ষেত্রে, যেখানে জাতীয় আইনে এসব ধারণা বিরাজমান, একই অধিকার ও দায়িত্ব; সকল ক্ষেত্রে শিশুদের স্বার্থই হবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ;

ছ) বিনামূল্যে অথবা মূল্যের বিনিময়ে সম্পত্তির মালিকানা, তা অর্জন, ব্যবস্থাপনা, পরিচালনা, ভোগ ও নিষ্পত্তির ব্যাপারে স্বামী-স্ত্রী উভয়ের একই অধিকার।

২। শিশুকাল বাগদান ও শিশু বিবাহের কোনো আইনগত কার্যকারিতা থাকবে না, এবং বিবাহের একটি সর্বনিু বয়স নির্ধারণ ও সরকারী রেজিষ্ট্রিতে বিবাহ রেজিষ্ট্রিভুক্ত করা বাধ্যতামূলক করার জন্য আইন প্রণয়নসহ প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

নারী উত্ত্যক্তকরণের প্রতিকার ও প্রতিরোধ

আইনে যা আছে

ধারা ৫০৯ দন্ডবিধি : কোনো নারীর শালীনতার অমর্যাদা করার অভিপ্রায়ে যদি কোনো মন্তব্য, কোনো শব্দ বা অঙ্গভঙ্গি বা কোনো বস্তু প্রদর্শন করে, যা উক্ত নারী অনুরূপ মন্তব্য বা শব্দ শুনতে পায় বা অনুরূপ অঙ্গভঙ্গি বা বস্তু দেখতে পায় কিংবা উক্ত নারীর নির্জনবাসে প্রবেশ করে, তবে সেই ব্যক্তি এক বছর পর্যন্ত কারাদন্ড বা অর্থদন্ডে বা উভয় দন্ডে দন্ডিত হবে।

ধারা-৭৬ : ডিএমপি অধ্যাদেশ (একই ধরনের বিধান অন্যান্য মহানগর এলাকায় প্রচলিত)

স্বেচ্ছায় কোনো রাস্তায় বা সাধারণের ব্যবহার্য স্থানে কোনো মহিলাকে পীড়ন বা তার পথ রোধ অথবা কোন রাস্তায় বা সাধারণের ব্যবহার্য স্থানে অশালীন ভাষা ব্যবহার করে অশ্লীল আওয়াজ, অঙ্গভঙ্গি বা মন্তব্য করে কোন মহিলাকে বিরক্ত করলে, ১ বৎসর কারাদন্ড অথবা ২ হাজার টাকা জরিমানা অথবা উভয় দন্ডে দন্ডিত হবে।

নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন (সংশোধিত ২০০৩)

ধারা-৯ (ক) : নারীর আত্মহত্যায় প্ররোচনা

কোনো নারীর সম্ভ্রমহানি ঘটার প্রত্যক্ষ কারণে আত্মহত্যা করলে উক্ত ব্যক্তি উক্ত নারীকে আত্মহত্যায় প্ররোচিত করার অপরাধী হবে এবং অনধিক দশ বৎসর কিন্তু অন্যূন পাঁচ বৎসর সশ্রম কারাদন্ডে দন্ডনীয় হবে এবং এর অতিরিক্ত অর্থদন্ডেও দন্ডনীয় হবে।

ধারা-১০: যৌন পীড়ন ইত্যাদির দন্ড

অবৈধভাবে যৌন কামনা চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে কোনো নারীর শরীরের যে কোনো অঙ্গ বা কোনো বস্তু দ্বারা কোনো নারী বা শিশুর যৌনাঙ্গ বা অন্য কোনো অঙ্গ স্পর্শ করলে সেই কাজটি হবে যৌনপীড়ন। এ কাজের জন্য সেই ব্যক্তি অনধিক দশ বৎসর কিন্তু অন্যূন তিন বৎসর সশ্রম কারাদন্ডে দন্ডনীয় হবে এবং এর অতিরিক্ত অর্থদন্ডেও দন্ডনীয় হবেন।

অর্ন্তভুক্তি বাInclusionকি?

সমাজ তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা অনুযায়ী অর্ন্তভুক্তকরণ হচ্ছে বৃহত্তর কোন কিছুর অংশ হিসাবে অবস্থান করা অথবা ভূমিকা রাখা। সামাজিক প্রেক্ষাপটে অর্ন্তভুক্তি মানে ব্যক্তির নিজস্ব দক্ষতার ভিত্তিতে, জাতিগত অবস্থান, সামাজিক অবস্থান, জেন্ডার বা বয়স নির্বিশেষে যে কোন সামাজিক প্রক্রিয়ায় পরির্পূণ এবং সমান ভাবে অংশগ্রহণের সম্ভাবনা ও সুযোগ তৈরী করা। অর্ন্তভুক্তিকরণ কোন ব্যক্তির উপর প্রয়োগের বিষয় নয়, বরং এটা এমন একটি বিষয় যেখানে মানুষ সক্রিয় ভাবে অংশ নেয়। অন্তভুক্তিকরণের র্চচা মানুষের বৈচিত্র্যকে স্বীকার ও সম্মান জানিয়ে সমাজ বোধ ও সমাজ সংশ্লিষ্ট হওয়ার মধ্য দিয়ে জীবনের সকল ক্ষেত্রে মানুষের অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করে।

প্রায়োগিক অর্থে সামাজিক অর্ন্তভুক্তিকরণ হচ্ছে এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে মানুষের সামাজিক অবস্থান নির্বিশেষে সবার জন্য সমান সুযোগ তৈরীর উদ্যোগ নেয়া হয়, যাতে তারা জীবনের সকল সম্ভাবনা গুলো অর্জন করতে পারে।

উন্নয়ন দর্শনে বলা হচ্ছে ”এটি একটি বহুমাত্রিক প্রক্রিয়া যার লক্ষ্য হচ্ছে এমন একটি সামাজিক পরিস্থিতি তৈরী করা যেখানে সমাজের মানুষকে জীবনের সকল ক্ষেত্রে অর্থাৎ সামাজিক, অর্থনৈতিক, নাগরিক ও রাজনৈতিক সহ সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় পরিপূর্ণ ও সক্রিয় অংশগ্রহনে সক্ষম করে।